পরিমার্জিত ডিপিএড
প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি)

মডিউল ৪: শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং শিল্পকলা

উপমডিউল ১

শিল্পকলা

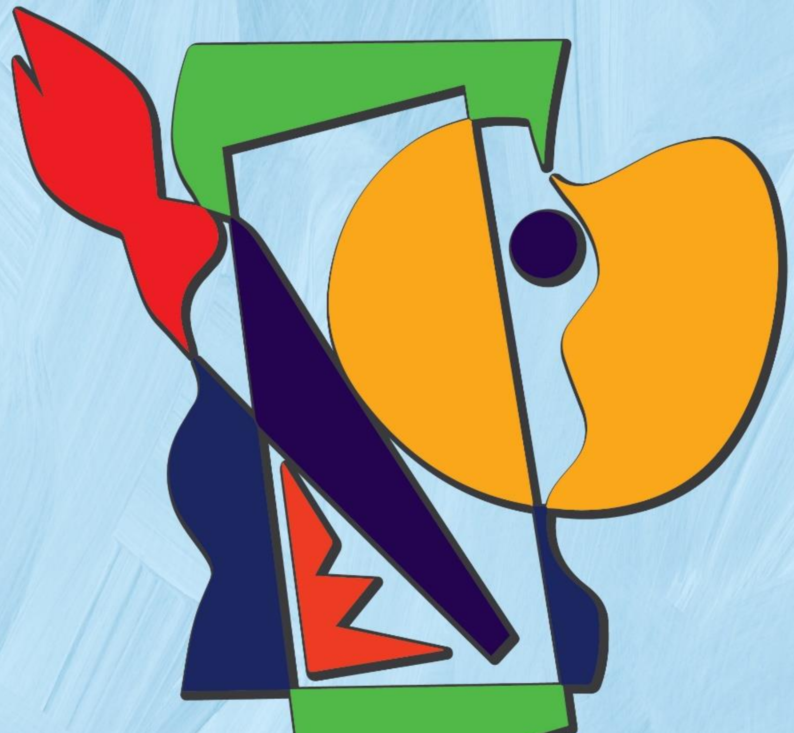

তথ্যপুস্তক

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

লেখক
মোঃ মোতিউল ইসলাম মিয়া মোঃ মেহবুবুর রহমান এনমুন আহমেদ মোঃ জাকির হোসেন ফকির
লেখক (পরিমার্জিত সংস্করণ)
মোঃ মোতিউল ইসলাম মিয়া, ইন্সট্রাক্টর (চারু ও কারুকলা), পিটিআই ঝিনাইদহ মোঃ মিলন সরকার, ইন্সট্রাক্টর (চারু ও কারুকলা), পিটিআই জয়পুরহাট সুমন মল্লিক, ইন্সট্রাক্টর (চারু ও কারুকলা), পিটিআই ব্রাহ্মণবাড়িয়া

পরিমার্জনে সহযোগিতা

মোহাম্মদ আমিনুল হক, সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
রেজিনা আকতার, শিক্ষা অফিসার, প্রশিক্ষণ বিভাগ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
সমর কুমার বিশ্বাস, ইন্সট্রাক্টর (চারু ও কারুকলা), পিটিআই ভোলা
জান্নাতুল রায়হানা, ইন্সট্রাক্টর (চারু ও কারুকলা), পিটিআই মাদারীপুর
মোঃ রাজীব হোসেন, ইন্সট্রাক্টর (চারু ও কারুকলা), পিটিআই নাটোর
মোঃ লুৎফুল হায়দার আল-মাসুম, ইন্সট্রাক্টর (চারু ও কারুকলা), পিটিআই রংপুর

প্রধান সমন্বয়ক

ফরিদ আহ্মদ
মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ

সমন্বয়ক

মাহবুবুর রহমান
সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

মোঃ ইমামুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
জিয়া আহমেদ সুমন, পরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
ড. মোহাম্মদ রুহুল আমীন, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
মোহাম্মদ আহসান ইবনে মাসুদ, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ময়মনসিংহ
মোঃ আব্দুল আলীম, উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ বিভাগ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মোঃ জহুরুল হক, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
সাদিয়া উম্মুল বানিন, উপপরিচালক (প্রশাসন), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
এ কে এম মনিরুল হাসান, উপপরিচালক (মূল্যায়ন), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)

প্রচ্ছদ

সমর এবং রায়হানা

প্রকাশক ও প্রকাশকাল

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
জানুয়ারি, ২০২৫

মুখবন্ধ

বিশ্বায়নের যুগে শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। পরিবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার আলোকে শিক্ষার্থীকে বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের মডেল সব সময় পরিবর্তনের ও পরিমার্জনের দাবি রাখে। শিক্ষকের প্রায়োগিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এবং প্রশিক্ষণকে অর্থবহ করতে আমাদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সবসময় সমন্বয় করা হয়।

শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন বা কার্যকর শিখনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছেন শিক্ষক। তবে শিক্ষকের যথাযথ প্রস্তুতির অভাবে শিক্ষার্থীর উন্নয়ন পরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন হয় না। আবার প্রশিক্ষণ উপকরণ, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষকের মান ইত্যাদির ন্যূনতার কারণেও শিক্ষকের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ব্যাহত হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে একজন শিক্ষকের বিষয়বস্তু ও কার্যকর শিখন-শেখানো কৌশল সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা জরুরি।

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান অর্জনের লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রবর্তিত ডিপিএড (ডিপ্লোমা-ইন-প্রাইমারিএডুকেশন) কোর্স এযাবতকাল মানসম্মত শিক্ষক বিনির্মাণে ভূমিকা রেখেছে। পরবর্তীতে ডিপিএড ইফেক্টিভনেস স্টাডি-এর মাধ্যমে ও সময়ের পরিক্রমার সাথে ডিপিএড কোর্সের সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে ডিপিএড কোর্স পরিমার্জন করে ১০ মাসব্যাপী পরিমার্জিত ডিপিএড (প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ-বিটিপিটি) কোর্সটি চালু করা হয়। পরবর্তীতে বিটিপিটি ইফেক্টিভনেস স্ট্যাডি, মনিটরিং রিপোর্ট ও স্টেক হোল্ডারদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিটিপিটি কোর্সের পিটিআই অধিবেশনভিত্তিক ও অনুশীলনভিত্তিক (৭ মাস ও ৩ মাস) সময়কালে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়। পরিবর্তিত সময়সূচির সাথে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে চলমান বিটিপিটি কোর্সে এই পরিমার্জন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের যেকোনো কোর্স পরিচালনার মূল লক্ষ্য হলো প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও সংশ্লিষ্ট শিখন সামগ্রীর সফল বাস্তবায়ন। ইতোমধ্যে শিক্ষাক্রমে যেমন ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছে তেমনি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের পরিমার্জনের কাজও চলমান।

বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে শিক্ষকগণের পেশাগত জ্ঞান ও প্রায়োগিক দক্ষতার মধ্যে কার্যকর নেতৃত্বের বিকাশ এবং শিক্ষকতা পেশায় সফলতা অর্জনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা জরুরি। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগতজ্ঞান ও উপলব্ধি, পেশাগত অনুশীলন ও মূল্যবোধের বিকাশ সাধনের মাধ্যমে দক্ষ, সৃজনশীল, সহযোগিতামূলক মনোভাবাপন্ন, অভিযোজনক্ষম এবং প্রতিফলনমূলক অনুশীলন ও জীবনব্যাপী শিখনে আগ্রহী শিক্ষক তৈরি হবেন বলে আশা করা যায়।

এ প্রশিক্ষণ মডিউল ও উপমডিউল প্রণয়ন, উন্নয়ন ও পরিমার্জনে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। মডিউল ও উপমডিউল সম্পাদনা ও পরিমার্জনের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে ধন্যবাদ জানাই।

পিটিআইতে শিক্ষক-প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত বিভিন্ন মডিউলের আওতায় উপমডিউলসমূহ নতুনভাবে প্রাণসঞ্চার করবে বলে আমি আশা করি।

(আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা)
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রসঙ্গকথা

বাংলাদেশের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রবর্তিত ডিপিএড (ডিপ্লোমা-ইন-প্রাইমারি এডুকেশন) কোর্স এযাবতকাল মানসম্মত শিক্ষক বিনির্মাণে ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু সময়ের পরিক্রমা ও যুগের চাহিদার সাথে যুৎসই পরিবর্তনের প্রত্যাশা নিয়ে ডিপিএড ইফেক্টিভনেস স্টাডি (DPEd Effectiveness Study) ও অন্যান্য গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে কোর্সটি পরিমার্জন করে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বেসিক ট্রেনিং ফর প্রাইমারি টিচারস-বিটিপিটি) কোর্স চালু করা হয়। শিক্ষক প্রশিক্ষণের যেকোনো কোর্স পরিচালনার মূল লক্ষ্য হলো প্রাথমিক শিক্ষাক্রম এর সফল বাস্তবায়ন ও সংশ্লিষ্ট শিখন সামগ্রীর যথাযথ ব্যবহার। ইতোমধ্যে শিক্ষাক্রমে যেমন ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছে তেমনি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণীত পাঠ্যপুস্তকেরও পরিমার্জনের কাজ চলমান। তাই সময়ের প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় সংস্কার ও যুগোপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রশিক্ষণকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে পিটিআই পর্যায়ে ১০ মাসব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি) কোর্সটি পরিমার্জন সময়ের দাবী হয়ে ওঠে। পরিমার্জিত প্রশিক্ষণটিতে প্রশিক্ষণার্থীগণ ০৭ মাস পিটিআইতে সরাসরি প্রশিক্ষণ এবং ০৩ মাস প্রশিক্ষণ/পরীক্ষণ/অনুশীলন বিদ্যালয়ে তাত্ত্বিক পেশাগত জ্ঞানের অনুশীলন করার সুযোগ পাচ্ছে।

এতে করে শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীগণ পিটিআইতে তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি অনুশীলন করবে। অনুশীলন বিদ্যালয়ে পেশাগত জ্ঞানের অনুশীলন এবং প্রয়োগের মাধ্যমে দক্ষতার উৎকর্ষ সাধন করবে। এতে করে শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রাপ্ত জ্ঞান নিজ বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করে মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারবেন।

শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন বা কার্যকর শিখনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছেন শিক্ষক। তবে শিক্ষকের যথাযথ প্রস্তুতির অভাবে শিক্ষার্থীর উন্নয়ন পরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন হয় না। আবার প্রশিক্ষণ উপকরণ, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষকের মান ইত্যাদির দুর্বলতার কারণেও শিক্ষকের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটে না। এ কারণে একজন শিক্ষকের বিষয়বস্তু, বিষয়গত জ্ঞান, কার্যকর শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরি।

১০ মাসব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণের (বিটিপিটি) আওতায় এ ম্যানুয়ালগুলোতে বর্ণিত অধিবেশনসমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্য শিক্ষকগণকে সরকারি চাকরির বিধি-বিধান পরিচালন ও শ্রেণি পাঠদানে তাঁর অবদান রাখতে সহায়তা করবে। অংশীজনের মতামত ও চাহিদার ভিত্তিতে এই মডিউলসমূহের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্বাচিত বিষয়বস্তুর আলোকে জাতীয় পর্যায়ের দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক বিষয়বস্তুর পরিমার্জন ও ক্ষেত্রবিশেষে উন্নয়ন করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে ব্যবহারকারী ও বিশেষজ্ঞগণের মতামত নিয়ে চূড়ান্ত করা হয়েছে।

মেধা ও নিরলস শ্রম দিয়ে এ মডিউল ও উপমডিউলসমূহ প্রণয়ন, উন্নয়ন ও পরিমার্জনে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের প্রতি আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(আবু নূর মোঃ শামসুজ্জামান)
মহাপরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

অবতরণিকা

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের দীর্ঘমেয়াদি সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন (সিইনএড) এবং পরবর্তীতে ২০১২ সাল থেকে চালু হওয়া ডিপ্লোমা- ইন-প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণ ডিজাইন, প্রশিক্ষণ সামগ্রী উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। সর্বশেষ ২০২৩ সালের জুলাই মাস থেকে আরম্ভ হওয়া পরিমার্জিত ডিপিএড (প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ-বিটিপিটি) বাস্তবায়নে কাজ করছে।

বিটিপিটি প্রশিক্ষণটি প্রচলিত সিইনএড ও ডিপিএড কোর্স থেকে ধ্যানধারণাগত দিক থেকে এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ নতুন। কোর্সটিকে যুগের চাহিদার সাথে সমন্বয় করা এবং মানসম্মত করার লক্ষ্যে কোর্স সামগ্রী ও নির্দেশিকা সামগ্রীগুলোতে পরিমার্জন প্রয়োজন হয়। সে অনুসারে ২০২১ সাল থেকে এই প্রশিক্ষণটির কারিকুলাম প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ ডিজাইন, প্রশিক্ষণ সামগ্রী উন্নয়নের কাজ আরম্ভ হয়। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে পাইলটিংভিত্তিতে নির্ধারিত ১৫টি পিটিআইতে বিটিপিটি প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়। পাইলটিং কার্যক্রম পরিচালনার সময় জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। পাইলটিংয়ের ফলাফল এবং মনিটরিং প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিটিপিটি প্রশিক্ষণের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ম্যানুয়াল ও তথ্যপুস্তকগুলো পরিমার্জন করা হয়। পরবর্তীতে বিটিপিটি ইফেক্টিভনেস স্টাডি ও স্টেক হোল্ডারদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিটিপিটি কোর্সের পিটিআই-ভিত্তিক অধিবেশন ও অনুশীলন সময়কাল ১০ মাস (৭ মাস ও ৩ মাস) নির্ধারণ করা এবং মূল্যায়ন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিমার্জন করা হয়।

এই মডিউলগুলো নতুন চাহিদাভিত্তিক পরিমার্জিত সংস্করণ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও আগ্রহ জেনে শিক্ষার্থীদের সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষকদের কাজ করার দক্ষতা বৃদ্ধিতে এই মডিউল এবং তথ্যপুস্তকসমূহ সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির তত্ত্বাবধানে এই পরিমার্জন কাজে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারসহ প্রাথমিক শিক্ষার মাঠপর্যায়ের প্যাডাগোজি ও এন্ড্রাগোজি বিশেষজ্ঞগণ কাজ করেছেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই ম্যানুয়াল এবং তথ্যপুস্তকসমূহ মানসম্মত ম্যানুয়াল এবং তথ্যপুস্তকে পরিণত হয়েছে। সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য আমি তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালকবৃন্দ, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ ম্যানুয়াল ও তথ্যপুস্তকসমূহ উন্নয়ন ও পরিমার্জনে বিভিন্নভাবে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করায় তাঁদেরকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। অনুরূপভাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়, অতিরিক্ত সচিববৃন্দ, যুগ্মসচিববৃন্দ এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিদের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ও সুচিন্তিত মতামত এই ম্যানুয়াল এবং তথ্যপুস্তকসমূহ কাঙ্ক্ষিত মানে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। সেজন্য আমি তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এয়াড়া, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, মেধা ও মননের ব্যবহার এবং নিরলস পরিশ্রমের ফলে তথ্যপুস্তক ও ম্যানুয়ালসমূহ এত অল্প সময়ে সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

পরিশেষে আমি মনে করি এই পরিমার্জিত ম্যানুয়াল ও তথ্যপুস্তকসমূহ পিটিআই ইন্সট্রাক্টর ও প্রশিক্ষণার্থীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য সহায়ক হবে। একইসঙ্গে এর যথাযথ ব্যবহার প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

(ফরিদ আহ্‌মদ)
মহাপরিচালক
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
ময়মনসিংহ

সূচিপত্র

অধিবেশন	অধিবেশন শিরোনাম	পৃষ্ঠা
৪.১.১	প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে শিল্পকলা	১
৪.১.২	প্রাথমিক স্তরে শিল্পকলার বিষয়বস্তু	৩
৪.১.৩	শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা বিকাশে চারু ও কারুকলা	৪
৪.১.৪	প্রাথমিক স্তরে অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ে পাঠদানের ক্ষেত্রে চারু ও কারুকলার গুরুত্ব	৫
৪.১.৫	ছবি আঁকার উপকরণ ও রং পরিচিতি	৮
৪.১.৬	চারু ও কারুকলার ব্যবহারিক দিক	১১
৪.১.৭	জাতীয় পতাকা, স্মৃতিসৌধ ও শহিদ মিনার এর ছবি অঙ্কন অনুশীলন	১৬
৪.১.৮	জাতীয় (মাছ, পাখি, ফুল ও ফলের) ছবি অঙ্কন অনুশীলন	১৮
৪.১.৯	জাতীয় পশু ও জাতীয় বৃক্ষের ছবি অঙ্কন অনুশীলন	২০
৪.১.১০	প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কন অনুশীলন	২১
৪.১.১১	মাটি/আর্টিফিসিয়াল ক্লে, কাগজের মণ্ড দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি	২৩
৪.১.১২	সংগীত শিখন শেখানো কৌশল	২৬
৪.১.১৩	সংগীত সাধকগণ ও সংগীতে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র পরিচিতি	২৭
৪.১.১৪	জাতীয় সংগীত অনুশীলন	৩১
৪.১.১৫	লোক সংগীত ও ছড়া গান অনুশীলন	৩২
৪.১.১৬	নৈতিক শিক্ষামূলক ও উদ্দীপনামূলক গান অনুশীলন	৩৪
৪.১.১৭	নৃত্য শিখন শেখানো কৌশল	৩৬
৪.১.১৮	লোকগানে নৃত্য	৩৭
৪.১.১৯	নাট্যকলা ও অভিনয়	৩৮
৪.১.২০	অভিনয়ের প্রাথমিক ধারণা ও প্রয়োগ	৩৯

সহায়ক তথ্য-০১:	প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে শিল্পকলা

অংশ-ক	শিল্পকলা

শিল্পকলার সাথে পরিচিত হতে হলে প্রথমেই আমাদের জানতে হবে শিল্প বা শিল্পকলা কী? আসলে শিল্পকলাকে সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা কঠিন। কারো মতে দৃশ্য বা অদৃশ্য কোন ভাবরূপ শিল্পীর চিত্তরসে নবরূপায়িত হয়ে যে স্থিতিশীল রূপপ্রকাশ ঘটে তাকে শিল্পকলা বা সংক্ষেপে শিল্প বলে। (উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ) শিল্পের জগৎ ও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যময়তার জন্য শিল্পের সংজ্ঞায় মতপার্থক্য থাকলেও নিম্নোক্ত দুটি বিষয়ে অনেকের মধ্যেই মতানৈক্য রয়েছে; যেমন- প্রথমত, শিল্প হচ্ছে, মানুষের মধ্যে ভাব প্রকাশের যে একটি অবিরত তাগিদ রয়েছে তারই বাহ্যিক রূপায়ণ এবং দ্বিতীয়ত, শিল্প মানুষকে সত্য, সুন্দর এবং মঙ্গলের কাছাকাছি নিয়ে যায়। *(শিল্পে নান্দনিকতা: দর্শন, লোপামুদ্রা চক্রবর্তী, অতিথি অধ্যাপিকা, মেমরি কলেজ, কলকাতা)*।

শিল্পের বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে; যেমন- চারু ও কারুকলা (চিত্রকলা ও কারুশিল্প), সংগীত, বাদ্য, নৃত্য, অভিনয়, সাহিত্য, ভাস্কর্য, স্থাপত্য ইত্যাদি।

শিশু বিকাশে শিল্পকলার গুরুত্ব বিবেচনায় প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় শিল্পকলাকে বিষয় হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষায় শিল্পকলা বিষয় হিসেবে যেমন গুরুত্বপূর্ণ অনুরূপভাবে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিকে অন্যান্য বিষয়ে পাঠদানের ক্ষেত্রেও শিল্পকলার গুরুত্ব অপরিসীম।
প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণে শিল্পকলা নামে একটি বিষয়ে শিল্পের চারটি মাধ্যমকে সন্নিবেশ করে উপস্থাপন করা হয়েছে। মাধ্যমগুলো হলো - ১) চারু ও কারুকলা ২) সংগীত ৩) নৃত্যকলা এবং ৪) নাট্যকলা।

শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা বিকাশে শিল্পকলা
প্রতিটি শিশুই অনন্য ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, চাহিদা, পছন্দ-অপছন্দ, চিন্তা, আচরণ ইত্যাদির ভিন্নতার কারণেই তারা বৈচিত্র্যপূর্ণ। শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার্জন দিয়ে শিশুর সার্বিক বিকাশ সম্ভব হয়ে ওঠে না। শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের পূর্ণতা পেতে বই, খাতা, কলমের পাশাপাশি শিল্প ও সাংস্কৃতিক চর্চা অপরিহার্য। শিশুর সুষম ও সমন্বিত বিকাশ নিশ্চিত করতে তার পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার বৃদ্ধি করা জরুরি। যা শিল্পকলার প্রায় প্রতিটি শাখার চর্চার মাধ্যমে নিশ্চিত করা সম্ভব।

একটি শিশু অপার সম্ভবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। মানুষ কোন বিষয়ে পূর্ণতা নিয়ে বা প্রতিষ্ঠিত হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। জন্মের পর তার আগ্রহ ভাললাগার ওপর ভিত্তি করে চর্চার মাধ্যমে এক একটি বিষয়ে এক একজন মানুষ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠেন। আমরা বলতে পারি না যে, আজকের শিশুটির মধ্যে একজন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা বিজ্ঞানীর পাশাপাশি লুকায়িত নেই আগামীর জয়নুল আবেদীন, রবীন্দ্রনাথ, রুনা লায়লা, রাজ্জাক, কবরী বা বুলবুল চৌধুরী। শিল্পসত্বা নিয়ে যে শিশুটি জন্মগ্রহণ করেছে শিক্ষা ক্ষেত্রে তাকে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি শিল্প চর্চার সুযোগ দেওয়াই হলো শিশুর চাহিদা ভিত্তিক বিকাশের ক্ষেত্র নিশ্চিত করা।
প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক বিষয়ে পাঠদানের ক্ষেত্রেও শিল্পকলা বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম। পাঠের বিষয়বস্তু অনুযায়ী শিল্পকলার বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে পাঠ উপস্থাপন করলে প্রতিটি শিশু যেমন

আনন্দের সাথে শেখে-তেমনি তার শিখনফল অর্জিত হয় সহজে এবং শিখনফল দীর্ঘস্থায়ী হয়। এছাড়াও শ্রেণিকক্ষের কার্যাবলি সক্রিয় ও প্রাণবন্ত হয় এবং শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাঠে অংশগ্রহণ করে। আবার শিক্ষার্থীরা অন্যান্য বিষয়ে পাঠের ক্ষেত্রে মূর্ত থেকে বিমূর্ত ধারণা লাভের জন্য যে কল্পনা বা চিন্তা শক্তির প্রয়োজন তা শিল্পকলা চর্চার মাধ্যমে বিকশিত হয়। শিল্পকলার বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে অন্যান্য বিষয়ে পাঠদান যেমন আনন্দদায়ক করা যায় তেমনি আবার শিল্পকলা শিখনে শিশুরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে মনোযোগের সাথে ছবি আঁকে, গান গায়, দেহের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে নৃত্য করে, অভিনয় করে। এর মাধ্যমে শিশুর সৃজনী শক্তির বিকাশ ঘটে এবং উদ্ভাবনী ও কল্পনাশক্তির প্রসার ঘটে।

অংশ-খ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে শিল্পকলার গুরুত্ব

শিশুরা খেলতে খেলতে শেখে। তারা শেখে আঁকিবুঁকি, গান, ছন্দ-ছড়ার মাধ্যমে। তারা আঁকিবুঁকি, গান, আর ছন্দ-ছড়ার মাধ্যমে যেমন শেখে তেমনি আঁকিবুঁকি, গান আর ছন্দ ছড়াও শেখে। শিল্প আনন্দদায়ক। শিল্প শিখন আনন্দদায়ক; আবার শিল্পের মাধ্যমে শিখনও আনন্দদায়ক। শিশুদের শিখন পরিবেশ যতবেশি আনন্দদায়ক হবে শিখন ততবেশি ফলপ্রসূ হবে। সার্বিক বিবেচনায় প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় শিল্পকলা বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের শিক্ষায় শিল্পকলা বিষয়ের কিছু গুরুত্ব নির্ণয় করা যায়, যেমন-

- শিল্পকলার মাধ্যমে শিশু আকার, আকৃতি, রং, রূপ, গঠন ইত্যাদি ধারণা স্পষ্ট হয়।
- শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক হয়।
- শিল্পকলা চর্চা শিশুর মধ্যে যে শিল্পবোধ, সৌন্দর্যবোধের জন্ম দেয় তা শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নে সহায়তা করে।
- শিশুকে পরিবেশের সাথে পরিচয় ঘটায় এবং পরিবেশ সচেতন হতে শেখায়।
- শিশুর সৃজনীশক্তি, কল্পনাশক্তি বিকাশের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের দক্ষতা বৃদ্ধি করে।
- নান্দনিক মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করে।
- সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল হতে শেখায়।
- শিখন পরিবেশ আনন্দদায়ক ও ফলপ্রসূ করা যায়।

সহায়ক তথ্য-০২: প্রাথমিক স্তরে শিল্পকলার বিষয়বস্তু

অংশ-খ	শিল্পকলার বিষয়বস্তু
• আঁকার বিভিন্ন উপকরণ • মাটি দিয়ে জিনিস তৈরি • ছবি এঁকে নাচের ছবি উপস্থাপন • পারিবারিক আচার আচরণের ছবি • পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে ছবি আঁকা • ছবিতে দেশীয় ঐতিহ্য • জাতীয় সংগীত পরিবেশন • মূকাভিনয় • গান গেয়ে নৃত্য পরিবেশন • গানের সুরে ছড়া • পাপেট দিয়ে পাঠ চর্চা	• নৈমিত্তিক কাজ শারীরিক ভাষায় প্রদর্শন • পারস্পরিক শ্রদ্ধা জানাতে গান পরিবেশন • কবিতা আবৃত্তি • নাটক নিয়ে গল্প বলা • পরিবেশের উপাদান নিয়ে রান্না-রান্না খেলা • প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান নিয়ে ভঙ্গীমা প্রদর্শন • নাচ দেখে সাংস্কৃতিক উপাদান শনাক্ত করা • নির্বাচিত গানে দলগত নৃত্য • শারীরিক ও মৌখিক অভিব্যক্তির মাধ্যমে অনুকরণ • •

সহায়ক তথ্য-০৩:	শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা বিকাশে চারু ও কারুকলা

অংশ-ক	ছবি

অংশ-খ	চারু ও কারুকলার ব্যবহৃত উপকরণের তালিকা

চারুকলা	কারুকলা
পেনসিল (HB, 2B, 3B, 4B থেকে GB পর্যন্ত হতে পারে। যে পেনসিলের নম্বর যত বেশি হবে সে পেনসিলের দাগ তত মোটা এবং গাঢ় হবে)। চারকোল, প্যাস্টেল, কালি-কলম, রাবার (পেনসিলের দাগ মোছার জন্য)। রং (জল রং, প্যাস্টেল রঙ, পেনসিল রঙ, তেল রং, পোস্টার রং, অ্যাক্রেলিক)। তুলি (তুলি সাধারণত দুই ধরনের হয়, নরম এবং শক্ত। জল রং করার জন্য নরম তুলি ব্যবহার করা হয় এবং তেল রং এ ছবি আঁকার জন্য ব্যবহার করা হয় শক্ত তুলি যা হক ব্রাশ নামে পরিচিত। কাজের উপযোগিতা ভেদে তুলি বিভিন্ন সাইজের হয়ে থাকে) কাগজ (ছবি আঁকার উপযোগী কাগজের মধ্যে কার্টিজ পেপার অন্যতম। এছাড়া হ্যান্ড পেপার, টেকচার পেপার, আর্ট পেপার ইত্যাদি) ক্লিপ, বোর্ড, স্পেচিউলার ইত্যাদি।	কাদা-মাটি, টুকরা কাপড়, তুলা, উল, চট, পাট, পাট-কাঠি, তালপাতা, নারকেল পাতা, খেজুর পাতা, নারকেল মালা, নারকেল ছোবড়া, নুড়িপাথর, বিভিন্ন ধাতু, বাঁশ, বেত, ফেলে দেওয়া বা স্বল্প মূল্যের দ্রব্যাদি, ছুরি, সুঁই-সুতা, গাম, বিভিন্ন টুলস, বক্সবোর্ড, রং ইত্যাদি।

সহায়ক তথ্য-৪: প্রাথমিক স্তরে অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ে পাঠদানের ক্ষেত্রে চারু ও কারুকলার গুরুত্ব

অংশ-ক

চারু ও কারুকলার সঙ্গে অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের সম্পর্ক

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো মানব জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন। এই শিক্ষাকে সার্থক, সুন্দর, সৃষ্টিশীল ও ব্যবহার উপযোগী করে তোলা এবং শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করায় চারু ও কারুকলার ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ের বিষয় ভিত্তিক জ্ঞান অর্জনে চারু ও কারুকলার ব্যবহার দুটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করে। প্রথমত, এর ব্যবহার শিখন পদ্ধতিকে প্রাণবন্ত করে তোলে, দ্বিতীয়ত, সক্রিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিষয় ভিত্তিক দক্ষতাজ্ঞান গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়।

বাংলা

বাংলা বিষয়ে পাঠদানের জন্য পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে চারুকলা অনন্য ভূমিকা পালন করে। বিষয়বস্তু উপস্থাপনে বিভিন্ন ছবির ব্যবহার পাঠকে আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত করে। বাংলা লেখা শেখাতে চারুশিল্পের দক্ষতা বিভিন্ন কাজে লাগে। আবার শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষা উপকরণের ব্যবহারের একটি গুরুত্ব রয়েছে যা প্রায়শই, চারু ও কারুশিল্পের মাধ্যমে তৈরি করা হয়। একসাথে একাধিক ইন্দ্রিয় এর ব্যবহার করে পাঠদান করতে পারলে শিক্ষা স্থায়ী ও আকর্ষণীয় হয়। এক্ষেত্রে বাংলা পাঠদানে চারু ও কারুকলা একটি বিশেষ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। যেমন একটি কবিতা ‘‘মেঘের কোলে রোদ হেসেছে’’ ছবির মাধ্যমেও উপস্থাপন করা যায়। এতে ভাষা শিক্ষায় আবৃত্তি ভূমিকার পাশাপাশি, ছবির বর্ণনার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থী ভাষা ব্যবহারের সুযোগ পায় এবং তা তাকে কবিতার ভাববস্তু বুঝতে সাহায্য করে। একইভাবে গানের মাধ্যমেও কবিতাটির ভাববস্তু তুলে ধরা যায়।

ইংরেজি

শিশুকে বর্ণমালা শেখাতে বাংলার মত ইংরেজিতেও ছবির ব্যবহার খুবই প্রয়োজন। ছবির সাথে শিশু প্রথম পরিচিতি লাভ করে তারপর বর্ণ সম্পর্কে জানে মন: -- Apple – ‘A’; -- Ball -- ‘B’ ইত্যাদি। আবার ছবির সাহায্যে শিশু শিক্ষার্থীদের ইংরেজি শব্দ বা বাক্য শিখন অনেক সহজ হয়। ইংরেজি একটি বিদেশী ভাষা এবং এটি আয়ত্ত করা অনেক সময় কঠিন কাজ বলে মনে হয়। বর্ণনামূলক পাঠদান করলে শিশুরা কখনই অনুপ্রাণিত হয় না এবং পাঠের শিখনফলও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তাই অন্য সকল বিষয়ের মত চার্ট, মডেল ও ছবির সাহায্যে ইংরেজি পাঠদান করলে বিষয়বস্তু সহজ ও বোধগম্য হয়। যেমন−Visual Literacy সম্পর্কিত দক্ষতাগুলি ব্যবহারের মাধ্যমে একটি পোস্টারের ছবি বুঝতে ও বর্ণনা করতে ভাষাটির ব্যবহার হয়। এতে আনন্দের মধ্য দিয়ে ইংরেজি শেখা যায়। সেহেতু বলা যায়, একটি নতুন ভাষা শেখার জন্য শিক্ষা পদ্ধতিকে অর্থপূর্ণ করতে চারু ও কারুকলার ভূমিকা অপরিসীম।

গণিত

প্রাথমিক শিক্ষায় গণিত শিক্ষাদানের সাথে চারু ও কারুকলার ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। চারু ও কারুকলায় এমন সব বিষয় রয়েছে যা গণিত শিক্ষাদানে অপরিহার্য। চারু ও কারুকলার সহায়তায় ঐ সকল স্তর যতটা অর্থপূর্ণ ও সার্থকভাবে পাঠদান করা যায় তা অন্য কোনভাবে সম্ভব নয়। চিত্রের সাহায্যে গণিতে নতুন ধ্যান-ধারণার সঞ্চার করলে শিশুরা সহজেই বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে পারে। যেমন ছবির সাহায্যে যোগ বিয়োগ শেখানো যেতে পারে

আবার অঙ্কনেরও এমন অনেক স্তর আছে যেখানে গণিতের জ্ঞানের সহায়তা অপরিহার্য। কর্মতৎপর পদ্ধতিতে গণিত শিক্ষাদানের জন্য চারু ও কারুকলার কাজের মাধ্যমে গণিতের যে স্তর শিক্ষা দেয়া যায় সে স্তর সম্বন্ধে শিশুরা শুধু গণিতের জ্ঞানই লাভ করে না বরং চারু ও কারুকলার দক্ষতাও অর্জন করে। গণিতে পাঠদানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পকর্মের মাধ্যমে শিশুর মধ্যে শিল্প প্রতিভার আবিষ্কার এবং বিকাশের উপায় খুঁজে বের করতে পারে। গণিতের পরিমাপ সংক্রান্ত নিখুঁত জ্ঞানের জন্য চারু ও কারুকলার রং তুলি ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। তখন চারু ও কারুকলার সঠিক দক্ষতা অর্জনের জন্য গণিতের সংশ্লিষ্ট ধারণা লাভ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাতে চারু ও কারুকলার দক্ষতাই শুধু বৃদ্ধি পায় না বরং গণিতের ধারণাও তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শিশুর নিজ পরিবেশে যে সব বস্তু রয়েছে তার সবকিছু শ্রেণিকক্ষে আনা সম্ভব হয় না তাই ছবির সাহায্য গণিতের শিক্ষাদান সহজ হয়। শিশু সংখ্যার সাথে প্রথমে পরিচিত হয় না। তাই সংখ্যার সাথে ছবি থাকলে সংখ্যার ধারণা সহজে বোধগম্য হয়। তাছাড়া জ্যামিতিক শাস্ত্র পুরোটাই চারু ও কারুকলার উপর নির্ভরশীল। গণিত বিষয়ের বিমূর্ত ধারণাগুলো মূর্ত হয়ে উঠে চারু ও কারুকলার ব্যবহারে।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

শিশু শিক্ষায় বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়টির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো তার বিভিন্ন উপাদানের সরাসরি পরিচয় ঘটিয়ে পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনের অভ্যাস গঠন করা, অপরের প্রয়োজনের প্রতি সংবেদনশীল হওয়া, সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি সচেতন ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। বর্ণনামূলক পাঠদানের মাধ্যমে সে উদ্দেশ্য সাধন করা সম্ভব নয়। শিশুকে প্রত্যক্ষভাবে পাঠ সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলোর সঙ্গে পরিচিতি ঘটাতে হবে। অনেক ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষভাবে স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শের সাহায্যে বাস্তব উপস্থাপন করা সম্ভব হয় না। তখন সাহায্য নিতে হয় চারু ও কারুকলার উপর। ছবি বা মডেলের উপর ভিত্তি করে পাঠদান করতে হয়। এতে করে একই সাথে একাধিক ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করাও সম্ভব হয়। ফলশ্রুতিতে পাঠ দীর্ঘস্থায়ী ও বাস্তবভিত্তিক হয়। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠে শিক্ষক বাস্তব উপাদান প্রদর্শনের মাধ্যমে পাঠদান করবেন। কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যেখানে সুযোগ কম সেখানে এ বিষয়ের উপর পাঠদান করতে গিয়ে শিক্ষককে অবশ্যই চিত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পারিপার্শ্বিকতা শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরতে হবে। একইভাবে কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় সম্পর্কে ধারণা দিতে ছবি বা মডেল ব্যবহার খুবই প্রয়োজন। অনুরূপভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রাম ও শহর, হাট-বাজার, আচার-অনুষ্ঠান, জেলা, উপজেলা, বিভাগ, দেশ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান সম্পর্কে চিত্রের মাধ্যমে ধারণা দিলে শিক্ষার্থীরা সহজে বুঝতে পারে। সে কারণে বলা যায়, পরিবেশ পরিচিতি সমাজ বা বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে শিক্ষাদানে চারু ও কারুকলার ব্যবহার অপরিহার্য।

পরিবেশ পরিচিতি (বিজ্ঞান)

পরিবেশ পরিচিতি (বিজ্ঞান) পাঠদানে চারু ও কারুকলার ভূমিকা অপরিহার্য। পাঠকে সার্থক, সজীব, চিত্তাকর্ষক, যুক্তিযুক্ত, সুষ্ঠু ও সহজবোধ্য করার জন্য বিভিন্ন ধরনের চিত্র, ডায়াগ্রাম, রেখাচিত্র, নক্‌শা প্রয়োজন হয় যা কেবলমাত্র শিশু শিক্ষায় নয় সকল শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যবহার করা প্রয়োজন। যেমন–ঋতু পরিবর্তন, সৌরজগৎ, চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ, জোয়ার-ভাটা ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা দিতে মডেল, চার্ট বা ছবির প্রয়োজন হয়। এছাড়া জীববিদ্যায়, পদার্থ বিদ্যাসহ বিভিন্ন পশু-পাখি পরিচিতি সম্পর্কে চার্ট ব্যবহার করে পাঠদান করলে শিক্ষার্থীর

কাছে পাঠ প্রাণবন্ত হয়। একইভাবে কৃষি বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিষয়ে পাঠদান করতে এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করতে চারু ও কারুকলার প্রয়োজন হয়।

শিশুর কর্মস্পৃহা এবং প্রাণচাঞ্চল্যকে সুষ্ঠু সুন্দর ও সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হলে পাঠের প্রতি তার অনুরাগ বা আগ্রহ সৃষ্টি করতে হয়। এটি শুধু পাঠ্যপুস্তক দ্বারা সম্ভব নয়। শিশুর কিছু মানসিক চাহিদা আছে, তা যথাযথভাবে পূরণ করতে, এবং তার চঞ্চল ও অস্থির প্রকৃতিকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করতে চারু ও কারুকলার সাহায্যে পাঠদান করা যেতে পারে। এতে শিক্ষাদান পদ্ধতি আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে এবং শিশু সেই আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। বিষয়ভিত্তিক আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি বর্তমান কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের সাথে চারু ও কারুকলার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় যা বিশেষ করে সক্রিয় শিক্ষা পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক।

সহায়ক তথ্য-৫	ছবি আঁকার উপকরণ ও রং পরিচিতি

অংশ-ক	চারু ও কারুকলার ব্যবহৃত উপকরণ

চিত্রাঙ্কনের জন্য যে সকল উপকরণ দরকার হয় তাকেই ছবি আঁকার উপকরণ বলা হয়। ছবি আঁকার নিমিত্তে ব্যবহার্য সকল প্রকার বস্তুকেই চিত্রাঙ্কন সামগ্রী বা উপকরণ বলা যেতে পারে। চিত্রাঙ্কনের তথা ছবি আঁকার জন্য বিভিন্ন ধরণের উপকরণ ব্যবহার করা হয়। যেমন-

পেনসিল

সাধারণ লেখা এবং ড্রইং করার জন্য আমরা সচরাচর এক ধরনের পেনসিল ব্যবহার করে থাকি। এ পেনসিলের গায়ে লেখা থাকে HB, এসব পেনসিলের শীষ তুলনামূলক একটু শক্ত এবং দাগ টানলে গাঢ় হয় না।ড্রইং করার জন্য নরম এবং শীষ মোটা পেনসিল যেমন- 2B, 3B, 4B এবং 6B প্রয়োজন হয়। 2B, 3B, 4B এবং 6B, এ চার মাত্রার যে কোন পেন্সিল দিয়ে পেন্সিল স্কেচ করা যায়।

কাগজ

ছবি আঁকার জন্য আমরা যে কোন কাগজ ব্যবহার করতে পারি। তবে মোটা সামান্য খসখসে কাগজ ছবি আঁকার জন্য উপযোগী । ছবি আঁকার মাধ্যম কালি, কলম, পেন্সিল, জল রং অথবা প্যাস্টেল রং এর উপর নির্ভর করে কাগজ বাছাই করে নিতে হয়। কালি কলমে আঁকার জন্য তুলনামূলকভাবে মসৃণ ও একটু মোটা কাগজ ভাল। পেন্সিল দিয়ে ছবি আঁকতে একটু মোটা সামান্য খসখসে কাগজ ব্যবহার করা হয় এবং একই ধরনের কাগজে জল রং ও প্যাস্টেল ব্যবহার করা যায়। তবে জল রং দিয়ে ছবি আঁকার জন্য হ্যান্ডমেড পেপার খুবই উপযোগী। ছবি আঁকার জন্য সাধারণ মানের একটি কাগজ পাওয়া যায় তা হলো কার্টিজ পেপার। এ ধরনের পেপারে প্রায় সব মাধ্যমে কাজ করা যায়। এছাড়া আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের কাগজ পাওয়া যায় যেমন- আর্ট পেপার, আর্ট কার্ড, অফসেট পেপার, বক্সবোর্ড, পিসবোর্ড, নানা প্রকার পাতলা আর্ট কার্ড, বিভিন্ন রং এর পোস্টার পেপার, নিউজ প্রিন্ট ইত্যাদি।

কালি কলম

আমরা সাধারণত লেখার কাজে কলম ব্যবহার করি। কলম দিয়ে ছবিও আঁকা যায়। ঝরণা কলম দিয়েও ছবি আঁকা যায়। কোন কোন সময় রঙিন কালি ব্যবহার করে ছবি আঁকলে বেশ মজার ছবি আঁকা যায়। ছবি আঁকার জন্য সাধারণত চাইনিজ ইঙ্ক ব্যবহার করে ছবি আঁকলে ভাল হয়। বর্তমানে মার্কার পেন বা সিগনেচার পেন দিয়েও সাদা কালো ও রঙিন ছবি আঁকা চলছে। বাঁশের কঞ্চি এবং খাগের কঞ্চি দিয়ে কলম তৈরি করে (মোটা বা চিকন) মজার ছবি আঁকা যায়। চারকোলও ছবি আঁকার একটি ভাল মাধ্যম। সাধারণত কাঠকে পুড়িয়ে চারকোল তৈরি হয়, তাই কাঠকয়লাকেও চারকোলের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

রং ও তুলি

রং হলো ছবি আঁকার অন্যতম একটি মাধ্যম বা উপকরণ। যেমন- জল রং, প্যাস্টেল রং, পোস্টার রং, অ্যাক্রেলিক রং, ফেব্রিক রং, পেন্সিল রং, তেল রং ইত্যাদি। রং এর মাধ্যম ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় তুলিও ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমের হয়ে থাকে। কালি ও জল রং এ ছবি আঁকার জন্য নরম পশম দিয়ে তৈরি করা তুলি ব্যবহার করা হয়। তেল রং এ ছবি আঁকার জন্য শক্ত পশম বা প্লাস্টিক এর তৈরি তুলি ব্যবহার করে থাকে। এটি সাধারণত শিল্পী কী ধরনের

ছবি আঁকবে তার উপর নির্ভর করে। সরু থেকে ধীরে ধীরে মোটার দিকে আঁকার জন্য বিভিন্ন নম্বরের তুলি ব্যবহার করা হয়। ০ থেকে শুরু করে ২০ বা তদুর্ধ্ব নম্বরের তুলি থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুরা ১ থেকে ১২ নং পর্যন্ত তুলি ব্যবহার করে থাকে।

বোর্ড, ক্লীপ ও ইজেল

বোর্ড ও ক্লীপ ছবি আঁকার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। বোর্ডে কাগজ রেখে ক্লিপ দিয়ে আটকিয়ে ছবি আঁকলে সুবিধা হয়। বোর্ড মেঝেতে রেখে, কোলের উপর রেখে বা ইজেলে রেখে ছবি আঁকা যায়। বোর্ডের ব্যবহার নির্ভর করে আঁকিয়ের/শিল্পীর বসার অবস্থানের উপর।

কারুকলার কাজ করা জন্যে নানান প্রকার উপকরণ

এছাড়াও কারুকলার কাজ করা জন্যে আরও নানান প্রকার উপকরণ প্রয়োজন হয়। যেমন- কাঁদা-মাটি, আর্টিফিসিয়াল ক্লে, কাগজের মণ্ড, আইকা আঠা, টুকরা কাপড়, তুলা, উল, চট, পাট, পাটকাঠি, ডিমের খোসা, তালপাতা, নারকেল পাতা, খেজুর পাতা, নারকেল মালা, নারকেল ছোবড়া, নুড়ি পাথর, বিভিন্ন ধাতু, বাঁশ, বেত, ফেলে দেওয়া বা স্বল্প মূল্যের দ্রব্যাদি, ছুরি, সুঁই-সুতা, গাম, বিভিন্ন টুলস, বক্সবোর্ড, রং ইত্যাদি।

অংশ-খ রং ও এর প্রকারভেদ

রং বা বর্ণ (Colour) হলো মানুষের দৃষ্টি সংক্রান্ত একটি চিরন্তন ধর্ম। রং বলতে রঞ্জক পদার্থবিশিষ্ট এক ধরনের তরল বা অর্ধতরল মিশ্রণকে বোঝায় যা কোনো পৃষ্ঠতলের উপর পাতলা স্তরের মত প্রয়োগ করা হয়, যা পরে শুকিয়ে ঐ পৃষ্ঠের উপরে একটি স্থায়ী শক্ত রঙিন প্রলেপে পরিণত হয়।

নিউটন পরীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন, যদিও সূর্যালোক দৃশ্যত বর্ণ-বিভাগহীন, কিন্তু মূলত তা সাতটি বর্ণ রশ্মির সম্মিলন। যাকে আমরা বাংলায় বলি ‘বেনীআসহকলা’। বেগুনী, নীল, আসমানী, সবুজ, হলুদ, কমলা এবং লাল। যে বস্তুতে সবকটি রং এর প্রতিক্ষেপ ঘটে-তা সাদা দেখায়, আবার যে-বস্তু সবকটি একসঙ্গে কোষণ করে তা কালো দেখায়। কোষণের ফলে আলোর অভাব ঘটে, তাই কালো হচ্ছে সম্পূর্ণ অন্ধকার।

বিশ্বখ্যাত চিত্রশিল্পী মাতিস রং সম্পর্কে বলেছেন যে, রং এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে চিত্রের প্রকাশময়তাকে যতটা সম্ভব সফল করা। রং এর সাথে আলোর নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। আলোর মধ্যেই যত রং এর খেলা। তাই আলোর পরিবর্তনের সঙ্গে রং এর পরিবর্তন ঘটে।

রং এর তারতম্যের উপর নির্ভর করে রং কে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

১. প্রথম স্তরের রং বা মৌলিক রং (Primary Colour),
২. দ্বিতীয় স্তরের রং বা মাধ্যমিক রং (Secondary Colour) এবং
৩. তৃতীয় স্তরের রং বা মিশ্র রং (Tersiary Colour)।

১. প্রথম স্তরের রং বা মৌলিক রং (Primary Colour):

যে রং অন্য কোন দুই বা ততোধিক রং-এর মিশ্রণে তৈরি হয় না, তাকে প্রথম স্তরের রং বা মৌলিক রং বলা হয়। মৌলিক রং তিনটি। যেমন- (১) লাল, (২) নীল এবং (৩) হলুদ।

২. দ্বিতীয় স্তরের রং বা মাধ্যমিক রং (Secondary Colour):

যে রং শুধুমাত্র দুইটি মৌলিক রং-এর মিশ্রণে তৈরি হয়, তাকে দ্বিতীয় স্তরের রং বা মাধ্যমিক রং বলা হয়। মাধ্যমিক রং তিনটি। যেমন-

(১) কমলা = লাল + হলুদ ।
(২) বেগুনী = নীল + লাল ।
(৩) সবুজ = হলুদ + নীল ।

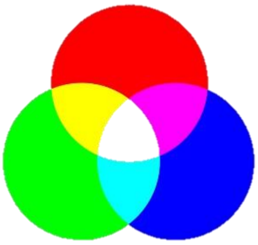

৩. তৃতীয় স্তরের রং বা মিশ্র রং (Tersiary Colour):
প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের রং-এর মিশ্রণে যে রং তৈরি করা হয়, তাকে তৃতীয় স্তরের রং বা মিশ্র রং বলা হয়। মিশ্র রং অগণিত যার কোন সীমা নেই । যেমন-

- কমলা + কমলা + হলুদ = কনক বা খাঁটি সোনার রং ।
- কমলা + লাল = ইটের রং।
- লাল + বেগুনী = আলতা রং।
- নীল + বেগুনী = ধুসর রং।

সাদা: সাদা হলো সব রং-এর সমষ্টি। অর্থাৎ সাদাতে সব রং বিদ্যমান থাকে।
কালো: কালো হলো সব রং-এর অনুপস্থিতি। অর্থাৎ কালোতে কোন রং থাকে না।

প্রকৃতিতে পাওয়া যায় এমন কিছু রং
শিশুরা রং খুব ভালবাসে। প্রকৃতিতে ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন রং যেগুলো দিয়ে খুব সহজেই শিশুদের বিনামূল্যে রং সম্পর্কে ধারণা দেওয়া যেতে পারে। যেমন-

হলুদ রং: কাঁচা বা শুকনো হলুদ থেকে পাওয়া যায়।
সবুজ রং: শিম পাতা বা গাঁদা ফুলের পাতাসহ যেকোন সবুজ পাতা থেকে পাওয়া যায়।
বেগুনী রং: পাকা পুঁইফল, ছিটকীফল থেকে পাওয়া যায়।
কমলা রং: মেহেদী পাতা ও শিউলী ফুল থেকে পাওয়া যায়।
কালো রং: কাঠ পোড়ানো কয়লা, পাতিলের কালি থেকে পাওয়া যায়।
খয়েরী রং: খয়ের গাছের ছাল, কচু গাছের রস, কাঁচা গাব ফল ও ডেউয়া গাছের ছাল সেগুন গাছের কচি পাতা থেকে পাওয়া যায়।

সহায়ক তথ্য-৬	চারু ও কারুকলার ব্যবহারিক দিক

অংশ-গ	চারু ও কারুকলার ব্যবহারিক দিক

চারু ও কারুকলার ব্যবহারিক উপাদানগুলোই হচ্ছে অঙ্কনের মূল বিষয় বা হাতিয়ার। ব্যবহারিক বিষয়গুলোর কোন একটির অনুপস্থিতি ছবিকে অসম্পূর্ণ করে রাখে। বাস্তবধর্মী একটি ছবি আঁকতে এর কোনটিকে বাদ দেয়ার সুযোগ নেই। যার জন্য অঙ্কন শেখার পূর্বে এই ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে ধারণা থাকা একজন আঁকিয়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অঙ্কনের মাধ্যমে শিক্ষক ব্যবহারিক দিকগুলোর কলা-কৌশল আয়ত্ত করে ছবি অঙ্কনের সময় তা প্রয়োগ করবেন। প্রশিক্ষক এবং শিক্ষককে অবশ্যই মনে রাখতে হবে এ নিয়ম কেবল বড়দের জন্য, শিশুদের জন্য নয়।

অনুপাত (Proportisn)
সমতা (Symmetry)
পরিপ্রেক্ষিত (Perspective)
আলোছায়া (Light and Shade)
ভারসাম্য (Balance)
কেন্দ্রীয় আকর্ষণ (Central Interse)
গঠন বা রচনাশৈলী (Compositisn)

অংশ-খ

অনুপাত (Proportisn)

অঙ্কনের জন্য অনুপাত একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। একই দৃশ্যপটে তুলনামূলকভাবে দেখা একটি জিনিস থেকে আর একটা জিনিস কত বড় বা কত ছোট, তাই অনুপাত। অনুপাতের সঠিক ব্যবহারের কোন বাস্তবধর্মী ছবিই সফল হতে পারে না। (একটি দৃশ্যপটে যদি একটি হাতি এবং একটি ছাগল আঁকা হয়, তাহলে হাতি ছাগলের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কত বড় হবে অথবা ছাগলটি তুলনামুলকভাবে কত ছোট হবে সেটা অনুপাতের মাধ্যমে ঠিক করা হয়)।

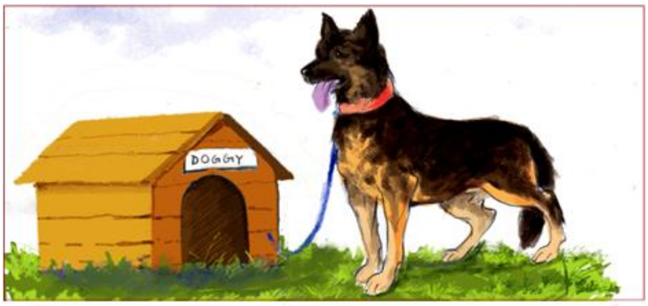

অনুপাত ঠিক নেই　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　অনুপাত ঠিক আছে

সমতা (Symmetry)

কোন জিনিসের মাঝামাঝি স্থান দিয়ে লম্বের মত একটি রেখা টানলে লম্বের দু'পাশের অংশ দু'টির আকার ও আকৃতিতে অবিকল একরকম থাকাকে সমতা বলে। উদাহরণ হিসেবে মানুষের মুখ, প্রজাপতি ইত্যাদি দিয়ে সমতা দেখানো হলো। বাস্তবধর্মী ছবি আঁকতে সমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

পরিপ্রেক্ষিত (Perspective)

অনুপাতের ন্যায় পরিপ্রেক্ষিতও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রত্যেক বাস্তবধর্মী চিত্রে এর সঠিক প্রয়োগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ছবির ভিতরে কোন একটি বস্তু অপর একটি বস্তু থেকে কত দূরে অবস্থান করছে এবং বিভিন্ন বস্তু কোন দৃষ্টিকোণ হতে শিল্পী দেখেছেন, এই দুটি দেখানোই পরিপ্রেক্ষিত। সোজা কথায় বলতে গেলে ছবিতে কোন বস্তুর দূরত্ব দেখাতে গেলে কাছের বস্তুটির আকার বড় আর যতই দূরে দেখানো হবে বস্তুটি ততই ছোট হয়ে যাবে এটাই পরিপ্রেক্ষিত। আকাশের প্রান্তরেখা নিচের দিকে আর জমিনের প্রান্তরেখা উপর দিকে যা সমুদ্রের তীরে দাঁড়ালে দেখা যায়। আকাশ দূরে যেন পানির সাথে মিশে আছে যাকে আমরা দিগন্ত রেখা বলে থাকি। দূরে গ্রামের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় কাছের গ্রামের চেয়ে দূরের গ্রামগুলো ছোট। আবার রেল লাইনের মাঝে দাঁড়ালে দেখা যায় রেললাইনের পাত দুটি দূরে এক বিন্দুতে মিশে আছে। তারপর তার পাশে অবস্থিত থাম/খাম্বা, রাস্তা, নদী ঠিক একইভাবে দূরে ছোট হয়ে গিয়েছে অনুভূত হয়। এটা যখন ছোট একটা কাগজে অঙ্কন করা হয় তখন বিশাল একটা জিনিস ছোট একটা কাগজের মধ্যে আনা যায়। তেমনি বড় একটা দালান

অঙ্কনের বেলায় সামনে বড় আর দূরের জিনিস ছোট অঙ্কন করি তখন তাকে পরিপ্রেক্ষিত বলি। তেমনি কালার পরিপ্রেক্ষিতের বেলায়ও কাছের রং স্পষ্ট এবং যতই দূরে যায় ততই রং হালকা হয়ে অস্পষ্ট হতে দেখা যায়।

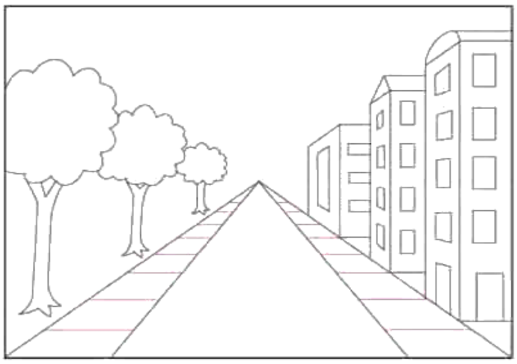

আলোছায়া (Light and shade)

আলোছায়া সঠিক প্রয়োগের উপর বাস্তবধর্মী ত্রিমাত্রিক ছবির রূপ নির্ভর করে। সীমারেখা অঙ্কন দ্বারা ত্রিমাত্রিক ছবির রূপায়ণ সম্ভব হলেও তাকে প্রকৃত বাস্তবধর্মী ছবি বলা যায় না। আলোছায়ার দ্বারা কোন একটি জিনিসের কাছে দূরে, উপর নিচ, বাম ও ডান সঠিকভাবে দেখানো যেতে পারে। বস্তুর যে অংশে আলো বেশি পড়ে সে অংশ বেশি আলোকিত ও স্পষ্ট দেখা যায় আর যে অংশে মাঝারি আলো আর যে অংশে আলো একেবারেই কম তা কম আলো আঁকতে হয়। অর্থাৎ ছবি অঙ্কনের ভাষায় যদি কোন বস্তুতে তিন রকমের আলো বা টোন ব্যবহার করা হয় তবে তাকে বাস্তবধর্মী চিত্র অঙ্কন বলে। যেমন–লাইট টোন, মিডল টোন, ডার্ক টোন–তিন রকম টোনের ব্যবহার একটা বাস্তবধর্মী চিত্রের রূপলাভ করে।

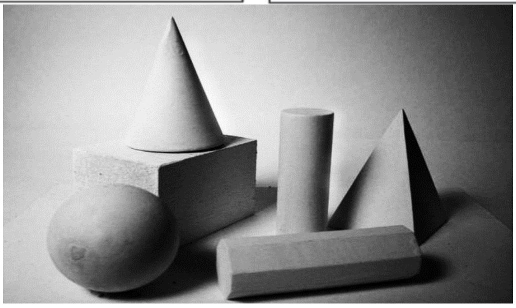

ভারসাম্য (Balance)

ছবির বিভিন্ন অংশের মধ্যে রেখা, রং ও বিষয়বস্তুর অবস্থান মোটামুটি মিল থাকাকে ভারসাম্য বলে। এর প্রধান কথা হল রেখা ও রং এর মাত্রা যেন সমপর্যায়ে থাকে। কোথাও যেন কোন বস্তু পরিমাণে বেশিও না হয় আবার কমও না হয়ে পড়ে। এখানে শিল্পীর স্বাধীনতা অনেক বেশি। ছবিকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করার জন্য রং, রেখা, বিষয়বস্তু যেন সমভাবে ব্যবহার করা হয় বা অঙ্কন করা হয়। তবেই ছবি ভাল লাগবে। তা না হলে ক্যানভাসে কোথাও ফাঁকা দেখা যাবে আবার কোথাও ভরা দেখা যাবে। কাজেই একটা সার্থক ছবির রূপদানে ভারসাম্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয়।

কেন্দ্রীয় আকর্ষণ (Central Interse)

কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু একটি ভাল ছবির মূল আকর্ষণ। মূল বিষয়বস্তুকে পরিশীলিত করার জন্য বা মূল বিষয়বস্তুকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়ার জন্য ছবির মধ্যে আরও কিছু ছোটখাটো বিষয়কে ব্যবহার করা হয়। প্রধান একটি বিষয়বস্তু

না থাকলে কোন ছবিই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না, ছবির অন্যান্য বিষয়ের গঠন এমন হবে যাতে দর্শকের দৃষ্টি মূল বিষয়বস্তুর উপর পড়ে।

গঠন বা রচনা শৈলী (Compositisn)

শিল্প সৃষ্টিকারী সে যেই হোন প্রথমে তিনি তাঁর ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর পূর্বে একটি খসড়া তৈরি করে নেন। খসড়া করার সময় অনেকটা Rough জিনিস থাকে বা কাটাকাটি করা হয়। শিল্পীও তেমনি যে বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি আঁকবেন তার খণ্ড চিত্র খসড়া এঁকে নেন যাকে গঠন শৈলী বলা হয়। খণ্ড চিত্রগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে তাঁর ছবিতে সংযোজন করে পরিপাটিভাবে চিত্রের রূপ দিয়ে থাকেন। গঠনরীতি যত ভালো ও পরিপাটি হবে ছবি তত নান্দনিক হবে।

সহায়ক তথ্য-৭	জাতীয় পতাকা, স্মৃতিসৌধ ও শহিদ মিনার এর ছবি অঙ্কন অনুশীলন

অংশ-ক জাতীয় পতাকা অঙ্কন কৌশল

বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ। লাখো শহিদের রক্তের বিনিময়ে পেয়েছি এ দেশ। লাল সবুজের জাতীয় পতাকা গৌরব ও অহংকারের প্রতীক। সবুজের মধ্যে লাল বৃত্ত উদীয়মান সূর্য এবং বৃত্তের চারপাশে গাঢ় সবুজ চির তারুণ্যের প্রতীক। পটুয়া কামরুল হাসান জাতীয় পতাকার নকশা অংকন করেন। আমাদের জাতীয় পতাকার একটি নির্দিষ্ট মাপ আছে। পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০:৬। অর্থাৎ দৈর্ঘ্য যদি ১০ ফুট হয় প্রস্থ হবে ৬ ফুট। পতাকার দৈর্ঘ্যের ২০ ভাগের ৯ ভাগে একটি লম্ব টেনে পরে প্রস্থের ঠিক মাঝখানে দৈর্ঘ্যের সাথে সমান্তরাল করে একটি রেখা টানুন। এ রেখাটির ছেদ বিন্দুকে কেন্দ্র করে একটি বৃত্ত আঁকুন। বৃত্তের ব্যাসার্ধ হবে দৈর্ঘের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। বৃত্তটি আঁকার পর অপ্রয়োজনীয় দাগগুলো মুছে ফেলুন।

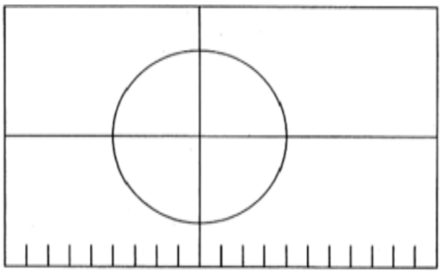

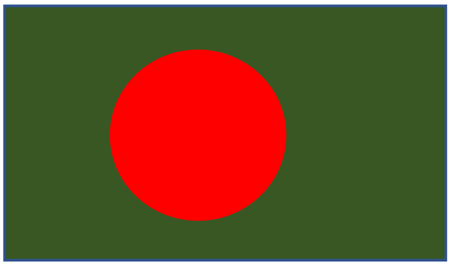

অংশ-খ জাতীয় স্মৃতিসৌধ ও শহিদ মিনার অঙ্কন কৌশল

'আমি দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা কারো দানে পাওয়া নয়'- অনেক রক্তের বিনিময়ে পাওয়া আমাদের দেশ। লাখো শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে স্বাধীনতা। ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, তরুণ-তরুণী, শিশু, বৃদ্ধসহ নাম না জানা অগণিত মানুষ। তাঁদের এই আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নির্মিত হয়েছে স্মৃতিসৌধ। স্থপতি অধ্যাপক মইনুল হাসান জাতীয় স্মৃতিসৌধের নকশা অঙ্কন করেছেন।

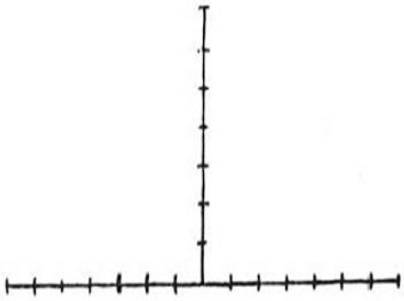

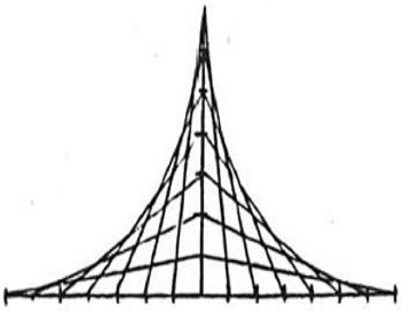

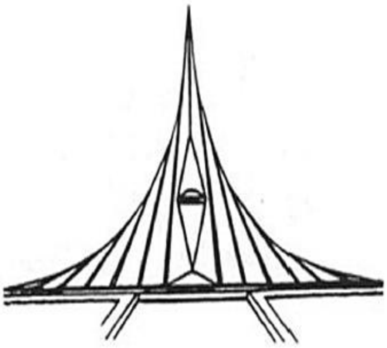

প্রথমে ১৪ ইঞ্চি লম্বা একটি ভূমি রেখা অঙ্কন করুন। ভূমি রেখার মাঝখানে সাড়ে ১০ ইঞ্চি মাপের একটি লম্ব টানুন। ভূমি রেখাকে ১ ইঞ্চি করে ভাগ করে ১৪ ভাগ এবং লম্ব রেখাকে সমান ৭ ভাগে ভাগ করুন। অতঃপর লম্ব রেখার উভয় পার্শ্বেই প্রথমে দাগের সাথে লম্ব রেখার উপরি ভাগ থেকে মিল করুন এবং অতিরিক্ত দাগগুলো মুছে ফেলুন। স্মৃতিসৌধের প্রকৃত মাপ ভূমি রেখা ১৮৪ ফুট এবং উচ্চতা ১৫৪ ফুট।

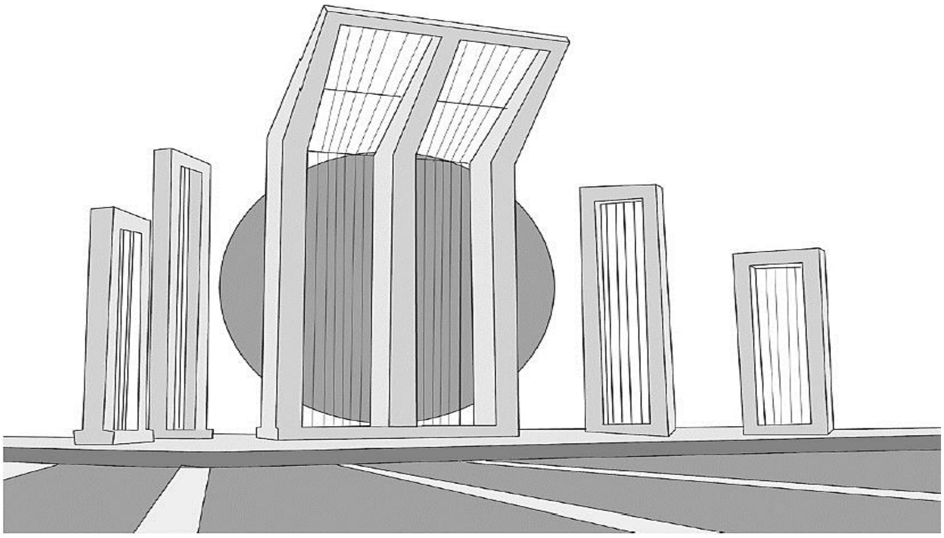

চিত্র: শহিদ মিনার

ভাষা আন্দোলনের দাবিতে **১৯৫২** সালের **২১** ফেব্রুয়ারি যাঁরা শহিদ হয়েছিলেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও স্মৃতি রক্ষার্থে শহিদ মিনার তৈরি করা হয়। প্রখ্যাত শিল্পী হামিদুর রহমান শহিদ মিনারের নক্শা অঙ্কন করেন। সহজে অনুসরণীয় কোন বাঁধা ধরা পদ্ধতি বা নিয়ম নাই যা অনুসরণ করে শহিদ মিনার অঙ্কন করা যায়। যিনি আঁকবেন তাঁর আগ্রহ বা ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোন ছক বা পদ্ধতি অবলম্বন করে তিনি আঁকতে পারেন। তবে শহিদ মিনারের মাঝখানে তিনটি স্তম্ভ একটু বড় এবং সামনের দিকে একটু বাঁকা/ঝোঁকানো থাকবে। দু'পাশে দু'টি স্তম্ভ একটু ছোট হবে। মাঝের স্তম্ভকে মায়ের এবং ছোট স্তম্ভ দু'টি সন্তানের প্রতীক হিসেবে আমরা ব্যবহার করি।

সহায়ক তথ্য-৮	জাতীয় মাছ, পাখির, ফুল ও ফলের ছবি অঙ্কন অনুশীলন

অংশ-ক	জাতীয় মাছ ইলিশ, জাতীয় পাখি দোয়েল, জাতীয় ফুল শাপলা, জাতীয় ফল কাঁঠাল এর অঙ্কন কৌশল

জাতীয় মাছ ইলিশ

দেশে বিভিন্ন ধরনের মাছ পাওয়া যায়। তার মধ্যে ইলিশ অত্যন্ত সুস্বাদু ও তৈলাক্ত মাছ। বাংলাদেশ ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও এত সুস্বাদু ইলিশ মাছ পাওয়া যায় না। তিনটি স্তরের উপর ভিত্তি করে জাতীয় মাছ (ইলিশ) অঙ্কন করা হয়েছে।

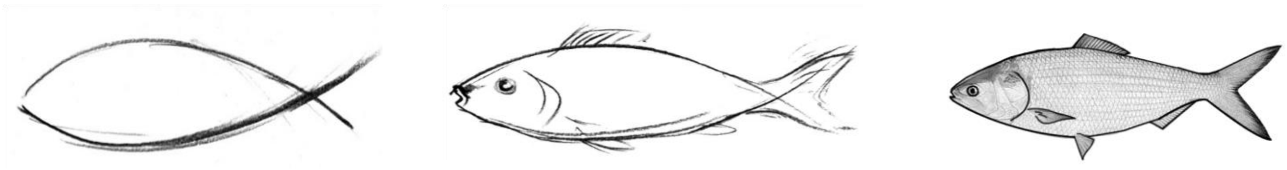

প্রথম স্তরঃ পাতা অঙ্কনের মত বাঁকা দুটি রেখা সামনা সামনি অঙ্কন করুন।

দ্বিতীয় স্তরঃ বাঁকা রেখাগুলোতে পেছনে লেজ, সামনের দিকে মাথা, মুখ এবং পাখা অঙ্কন করুন।

তৃতীয় স্তরঃ মাছের আঁইশ ও খোল অঙ্কন করার পর অপ্রয়োজনীয় লাইনগুলো মুছে ফেলুন।

জাতীয় পাখি দোয়েল

বাংলাদেশে অনেক প্রকারের পাখি আছে। তার মধ্যে দোয়েল পাখিকে জাতীয় পাখি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। দোয়েল আকারে ছোট হলেও রং ও আকৃতি খুবই আকর্ষণীয়। এদের দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায় এবং এর সুমধুর সুর আমাদেরকে আকৃষ্ট করে।

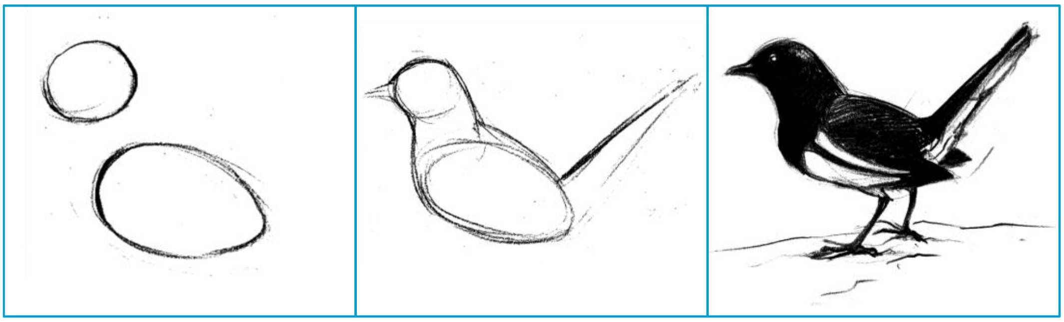

তিনটি স্তরের উপর ভিত্তি করে দোয়েল পাখির ছবি অঙ্কন করা হয়েছে।

প্রথম স্তরঃ ডিম্বাকৃতি অঙ্কন করে তার উপরে আর একটি ছোট ডিম অঙ্কন করুন।

দ্বিতীয় স্তরঃ নমুনা অনুযায়ী দু'টি সরল রেখা দ্বারা লেজ ও ঠোঁট অঙ্কন করুন এবং ডিমের নিচে দু'টি সরল রেখাদ্বারা পা অঙ্কন করুন।

তৃতীয় স্তরঃ কালো রং দিয়ে নমুনা অনুযায়ী রং করুন।

জাতীয় ফুল শাপলা

আমাদের জাতীয় ফুল শাপলা। গ্রাম বাংলার আনাচে-কানাচে, ডোবায়, বিলে-ঝিলে এ ফুলের বিচিত্র সমারোহ দেখা যায়। পল্লী বাংলার খাল-বিল, দিঘি আর সরোবরে শাপলা ফুল তার পবিত্র রূপ নিয়ে ফুটে ওঠে। বিভিন্ন রং এর শাপলা ফুল দেখতে পাওয়া যায়; সাদা শাপলা আমাদের জাতীয় ফুল। শাপলা ফুলের সৌন্দর্যের তুলনা নেই।

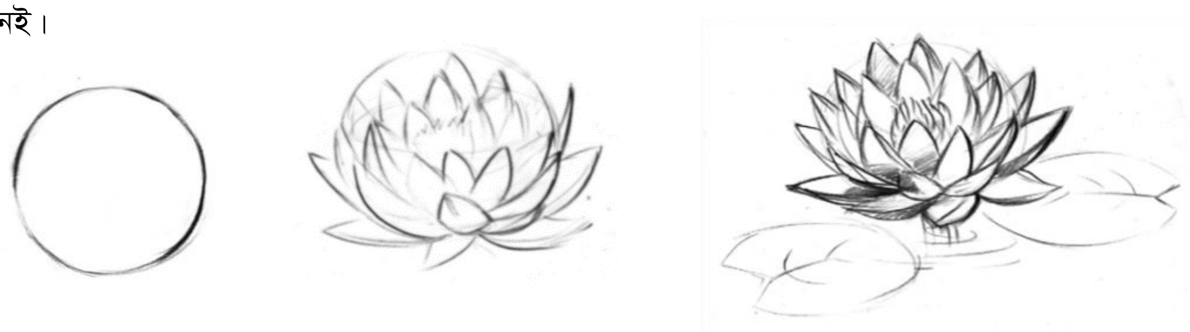

তিনটি স্তরের উপর ভিত্তি করে শাপলা ফুল অঙ্কন

প্রথম স্তর: একটি বৃত্ত অঙ্কন করুন।
দ্বিতীয় স্তর: বৃত্তের মাঝামাঝি স্থান থেকে শুরু করে কয়টি প্রধান পাপড়ি অঙ্কন করুন।
তৃতীয় স্তর: দ্বিতীয় স্তরে অঙ্কিত ফুলের প্রধান পাপড়ির উভয় পাশে সমান মাপের আরো পাপড়ি অঙ্কন করুন। প্রধান পাপড়ির নিচে দুটি রেখা টেনে শাপলা অঙ্কন করে বৃত্তের দাগ রাবার দিয়ে মুছে ফেলুন।

জাতীয় ফল কাঁঠাল

কাঁঠাল বাংলদেশের জাতীয় ফল। কাঁঠাল বাংলাদেশের সর্বত্রই কমবেশি পাওয়া যায়। এই ফল রসালো ও সুস্বাদু। এই ফলে বাংলাদেশের অন্যান্য ফলের চেয়ে প্রোটিন বেশি। তিনটি স্তরের উপর ভিত্তি করে কাঁঠাল অঙ্কন করা হয়েছে।

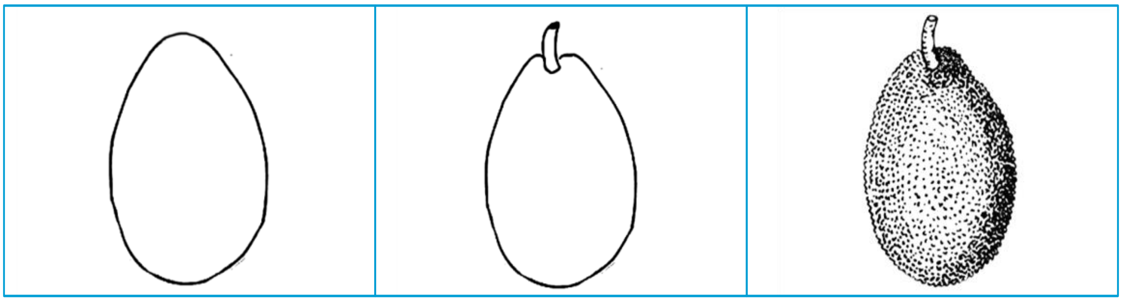

প্রথম স্তর: একটি ডিমের মত গোলাকৃতি অঙ্কন করুন।
দ্বিতীয় স্তর: ডিম্বাকৃতির উপরের অংশে ছোট দুটি রেখা বাঁকা করে টেনে একটি বোটা অঙ্কন করুন।
তৃতীয় স্তর: ডিম্বাকৃতির চারিপাশে ছোট ছোট (<<<) রেখা টেনে কাঁঠালের গায়ে কাঁটা এঁকে দিন। পরে অপ্রয়োজনীয় দাগগুলো মুছে ফেলুন।

সহায়ক তথ্য-৯	জাতীয় পশু ও জাতীয় বৃক্ষের ছবি অঙ্কন অনুশীলন

অংশ-ক: জাতীয় পশু বাঘ এর ছবি অঙ্কন কৌশল

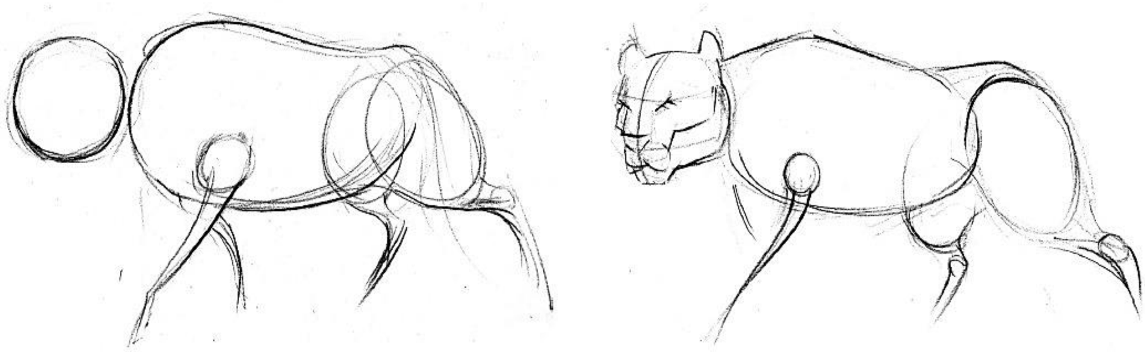

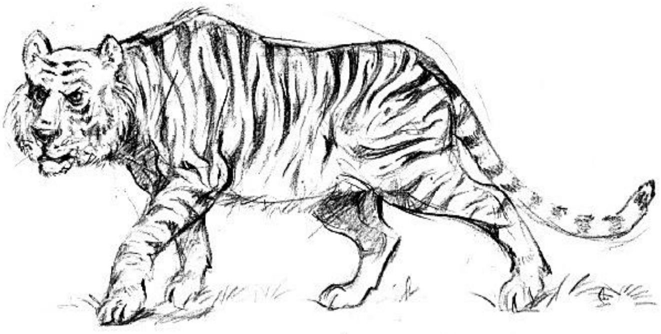

অংশ-খ	জাতীয় বৃক্ষ এর ছবি অঙ্কন কৌশল

সহায়ক তথ্য-১০	প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কন অনুশীলন ও রং করা

অংশ-ক	প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কন অনুশীলন ও রং করা

বিশ্ব প্রকৃতির অপরূপ সমারোহের মধ্যে আমাদের বসবাস। প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানের সাথে আমাদের আত্মিক একটা সম্পর্ক আছে। যার একটা প্রভাব ছবি আঁকতে পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতি নির্ভর বিষয়বস্তুকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–স্থান, কাল ও পরিবেশ। এই স্থান, কাল ও পরিবেশের প্রভাব যত স্বাভাবিক ও বাস্তবধর্মী হবে ছবিটি তত দৃষ্টিনন্দন ও প্রাণবন্ত হবে। বিষয়বস্তু অনুযায়ী চিত্রের চারপাশে সীমারেখা চিহ্নিত করে রং, অনুপাত, পরিপ্রেক্ষিত, আলোছায়া ও ভারসাম্য সঠিক ব্যবহার করে ছবি আঁকতে হবে। অনেক সময় সীমারেখা না টেনেও পুরোটা কাগজে ছবি আঁকা যায়। ছবি আঁকার সময় প্রথমেই একটা বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে অন্যান্য বিষয়বস্তুর সন্নিবেশ ঘটাতে হবে। যাতে ছবির ভারসাম্য ঠিক থাকে এবং দর্শক দেখে যেন বলে ছবিটি খুব সুন্দর হয়েছে।

স্বচ্ছ জল রং এটা পানি মিশ্রিত রং। ছবি আঁকার জন্য জল রং অন্যতম একটি মাধ্যম। এ রং এ ছবি আঁকার জন্য কিছুটা অভ্যাস থাকা প্রয়োজন। জল রং ছবি আঁকার সময় ছবির মধ্যে উজ্জ্বলতা এবং রং এর পরিপ্রেক্ষিত এর প্রভাব থাকতে হবে। ছবির মধ্যে এ প্রভাবগুলো রাখার জন্য অভিজ্ঞতা থাকার প্রয়োজন। জল রং এ ছবি আঁকার ক্ষেত্রে ৩টি পর্যায় শেষ করতে হয়। ফাস্ট ওয়াশ, সেকেন্ড ওয়াশ ও থার্ড ওয়াশ। অর্থাৎ প্রথমে বিষয়বস্তুটি পেন্সিল দিয়ে ড্রইং করে এর পর রং ব্যবহার করতে হবে। রং ব্যবহারের সময় ছবির বিষয়বস্তু অনুযায়ী প্রথমে হালকা করে রং দিতে হবে। দ্বিতীয় বার রং ব্যবহারে প্রথম বারে পানিতে রং এর পরিমাণ যতটুকু থাকবে তা থেকে বেশি গাঢ় করে দিতে হবে। তৃতীয় বার বা শেষ বারে দ্বিতীয় বার পানিতে যে পরিমাণ রং থাকবে তা থেকে বেশি গাঢ় করে লাইট এণ্ড শেড অনুযায়ী রং ব্যবহার করতে হবে। থার্ড ওয়াশে রং এর পরিমাণ বেশি নিয়ে বিষয়বস্তুর তারতম্য অনুসারে যথাস্থানে গাঢ় রং ব্যবহার করতে হবে।

জল রং এ আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ

প্যাস্টেল রং এ আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্য

সহায়ক তথ্য-১১	মাটি/আর্টিফিসিয়াল ক্লে, কাগজের মণ্ড দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি

অংশ-ক	মাটি তৈরির নিয়ম এবং শিল্পকর্ম তৈরি

সাধারণত এঁটেল মাটি হলো কোন জিনিস তৈরি করার জন্য উপযোগী। শুকনো এঁটেল মাটি গুড়ো করে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে পরিমাণ মত পানি মিশিয়ে কাজের উপযোগী করে নিতে হয়। সবচেয়ে ভাল হয় প্রকৃতি প্রাপ্ত এঁটেল মাটি পাওয়া গেলে। এঁটেল মাটি যদি বেশি ভেজা হয় তবে শুকনা চট দিয়ে ঢেকে যখন শক্ত কাদাতে পরিণত হয় তখন মাটি কাজের উপযোগী করার জন্য বার বার পিষে নিতে হয়। মাটি পিষে নেয়ার পর মাটি এমন একটা রূপ ধারণ করে যখন মাটিতে হাত দিলে মাটি হাতে লাগে না তখনই বুঝতে হবে মাটি কাজের জন্য উপযোগী হয়েছে। তাছাড়া মাটির সাথে যদি ইটের টুকরা বা শক্ত কোন ধরনের বস্তু বা জিনিস থাকে সেগুলো আলাদা করে নিতে হবে। তা না হলে তৈরিকৃত মডেল বা জিনিস ফেটে যেতে পারে।

মাটি দিয়ে কাজ করার সময় শিক্ষক মনে রাখবেন শিশু শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি উপযোগী বিষয়বস্তুই যেন তাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হয়। অর্থাৎ নিকট পরিবেশে পাওয়া যায় বা অতিপরিচিত বিষয়বস্তু যেমন–আম, পেঁপে, তাল, বেগুন, কলা, ঘাস, কাপ-পিরিচ, ফুলদানি, বাটি ইত্যাদি। শিশুর উপযোগী বিষয়বস্তু নিয়ে কাজ করার সময় ঐ বিষয় সম্পর্কে কতটুকু ধারণা আছে তা জানার জন্য বোর্ডে ড্রইং করে শিক্ষক শিক্ষার্থীর বিষয়ের গঠন সম্পর্কে ধারণা দিতে পারেন। মাটি দিয়ে কোন কিছু তৈরি করার সময় মনে রাখতে হবে যে, মাটি পেস্ট করার সময় অর্থাৎ মাটির উপর মাটি লাগানোর সময় যেন মাটির ভিতর বাতাস না থাকে। মাটির ভিতর বাতাস থাকলে মাটির তৈরি জিনিস ফেটে যেতে পারে। মাটির তৈরি মডেল প্রাথমিক অবস্থায় ছায়াতে শুকিয়ে নিয়ে পরে রোদে শুকালে ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। তৈরিকৃত মডেল সাধারণত পোড়ানো হয় না তাই সংরক্ষণের জন্য শুষ্ক জায়গায় রাখাই শ্রেয়।

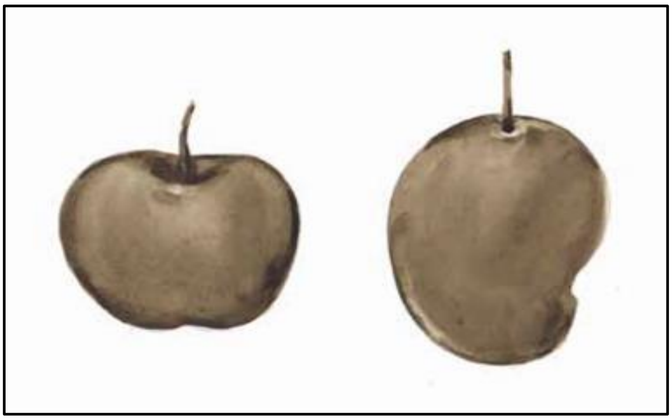

চিত্র: মাটি দিয়ে তৈরি মডেল

চিত্র: আর্টিফিসিয়াল ক্লে দিয়ে তৈরি শিল্পকর্ম

অংশ-খ	টিস্যু/টয়লেট পেপার/ফেলে দেয়া কাগজ (নিউজপ্রিন্ট) দিয়ে মণ্ড তৈরির পদ্ধতি

ছেঁড়া বা ফেলে দেয়া কাগজ দিয়ে মণ্ড তৈরির পদ্ধতি

প্রথম ধাপ

ফেলে দেয়া যে কোন নিউজপ্রিন্ট/নিউজ পেপার ছোট ছোট টুকরো করে কোন বালতি/গামলায় ৪/৫ দিন ভিজিয়ে রাখতে হবে। পানিতে ভেজার পর নরম হলে পানি বার করে ঝেড়ে নিয়ে পানি থেকে তুলে ফেলতে হবে। কাগজ অনেকদিন ভিজলে বা কাগজে ময়লা থাকলে অনেক সময় দুর্গন্ধ হয়ে যেতে পারে। তাই একটু ব্লিচিং পাউডার বা কয়েক ফোঁটা ডেটল দিলে দুর্গন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। এভাবে কাগজের মণ্ড তৈরি করে নিতে হবে। ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিলে ভালো।

দ্বিতীয় ধাপ

কাগজ অনুপাতে ময়দার কাই/আঠা তৈরি করে নিতে হবে। ময়দার কাই/আঠার বিকল্প হিসেবে আইকা গাম ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু এটা ব্যয়বহুল। যে কোন আঠা বা গামই ব্যবহার করুন না কেন তাতে একটু তুঁতে মিশিয়ে নিতে হবে। পরবর্তী সময় কাগজের এই মণ্ডের তৈরি জিনিসটি যেন কোন পোকামাকড় থেকে রক্ষা পায়।

তৃতীয় ধাপ

কাগজ আর গাম এক সাথে আনুপাতিক হারে মেশাতে হবে। কাজের উপযোগী যাতে সুন্দর একটি পেস্ট তৈরি হয়। মনে রাখতে হবে, যতটুকু মণ্ডের কাজ করবেন, ততটুকু মণ্ডতে গাম মেশাতে হবে। কারণ গাম মেশানো মণ্ড বেশিক্ষণ রাখা যাবে না। বাতাসে শুকিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সংরক্ষণের প্রয়োজন হলে পলি ব্যাগে রাখা যেতে পারে

কাগজ বা মণ্ড দিয়ে তিন ধরনের কাজ করা যায়

ছাচ ব্যবহার করে প্রথমে নিউজপ্রিন্ট কাগজ লম্বা করে কেটে নিতে হবে। তারপর পানিতে ভিজিয়ে ছাচের উপর পেঁচাতে হবে। প্রথমবার পেঁচানোর পর পরবর্তী কাগজে গাম লাগিয়ে পেঁচাতে হবে। এভাবে পর পর বেশ কয়েক বার পেঁচিয়ে একটা স্বাভাবিক পুরুত্ব এসে গেলে এর উপর মণ্ড অল্প অল্প করে লাগিয়ে শিল্পকর্মটির কাজ শেষ করতে হবে। এরপর শুকিয়ে গেলে ছাঁচটি বের করে নিতে হবে এবং প্রথমে এক দুই বার সাদা রং লাগিয়ে পছন্দ মত রং দিয়ে কাজটি শেষ করতে হবে। কাগজের এ ধরনের মণ্ড দিয়ে খেলনা পুতুল ছাড়াও নানা প্রকার মডেল তৈরি করা যায় যা রপ্তানি পণ্য হিসেবেও বহুল পরিচিত। যেমন- পুতুল, ফুলদানি, মুখোশ ইত্যাদি।

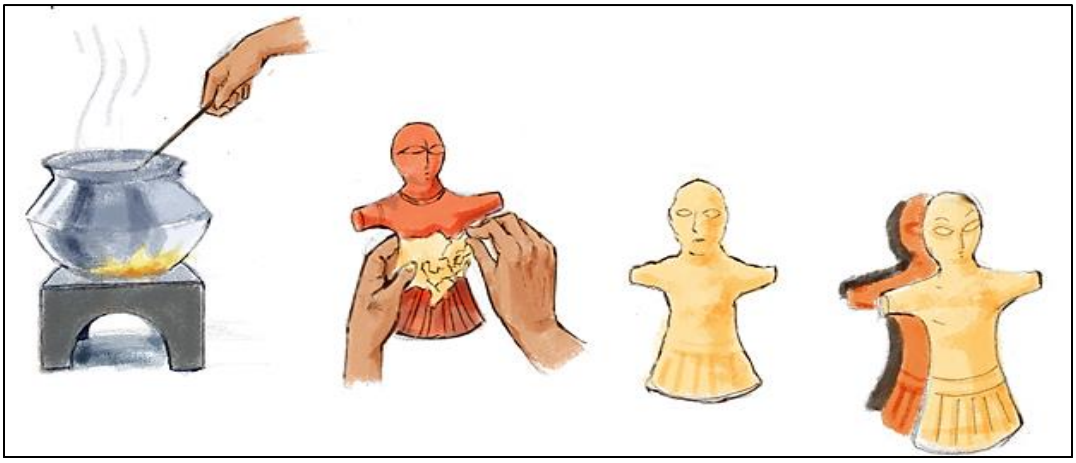

সহায়ক তথ্য-১২	সংগীত শিখন শেখানো কৌশল

অংশ-ক	সংগীত

সংগীত একটি ভাষা। অন্যান্য ভাষার ন্যায় সংগীতেরও আছে বর্ণমালার মতো স্বরমালা। সা রে গা মা পা ধা নি - ৭টি শুদ্ধ স্বর আর আছে ৫টি বিকৃত স্বর। পাঁচটি বিকৃত স্বরে ৪টি কোমল, ১টি কড়ি যথা: কোমল রে (ঋ), কোমল গা (জ্ঞ), কড়ি মা (হ্মা), কোমল ধা (দ) ও কোমল নি (ণ)।
এই ১২টি স্বরসমূহের বিন্যাসের মাধ্যমে রচনা করা হয় মনের ভাব।
ভাষা যেমন মনের ভাব প্রকাশ করে, তেমনি সংগীতও মনের ভাব প্রকাশ করে। সংগীতের অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে তাল বা ছন্দ। এ জন্যে স্বর ও তালে রচিত হৃদয়গ্রাহী রচনাকে সংগীত বলে।
গীত, বাদ্য ও নৃত্য - এই তিনটি কলাকে একত্রে সংগীত বলে। কথাটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, গীত, বাদ্য, নৃত্য - এই সকল কলা যখন তার পরিবেশনের মাধ্যমে একটি নান্দনিক পরিবেশ সৃষ্টি করে হৃদয়ে ভাবের সৃষ্টি করে, শাস্ত্র মতে তা সংগীত।

গীত: সুর, অর্থপূর্ণ শব্দ ও তালের সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করাকে গীত বলে।

বাদ্য: সুর ও তালের মাধ্যমে যন্ত্রের সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করাকে বলে বাদ্য। পৃথিবীতে বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র আছে। বিচিত্র বাদ্যযন্ত্রে বিচিত্র সুর।

নৃত্য: ছন্দ ও সুন্দর অঙ্গভঙ্গির সমন্বয়ে হয় নৃত্য। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, যখন ভাষা আবিষ্কার হয়নি, তখন হয়তো দেহের ভঙ্গি, চোখের ইশারা ইত্যাদি দিয়েই মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করেছে যুগের পর যুগ। সে কারণে তাঁরা বলেন, সংগীতের আদি শাখা হচ্ছে নৃত্য।

সহায়ক তথ্য-১৩	সংগীত সাধকগণ ও সংগীতে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র পরিচিতি

অংশ-ক	সংগীত সাধকের পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

১৮৬১ সালের ৭ মে কোলকাতার জোড়াসাঁকোর এক জমিদার পরিবারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম। তিনি শুধু বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন না, একই সঙ্গে ছিলেন গীতিকার, সুরকার, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, দার্শনিক, চিত্রকর এবং শিক্ষাবিদ। পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং পিতামহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যন্ত সংস্কৃতিবান ব্যক্তি ছিলেন। পিতামহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উচ্চাঙ্গ সংগীতে দক্ষ ছিলেন। পরিবারের অনুকূল পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ খুব ছোটবেলা থেকে কাব্যচর্চা শুরু করেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে সঙ্গীতচর্চার ব্যাপক প্রচলন ছিল। রবীন্দ্রনাথের বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য দাদারা নিয়মিত সংগীত চর্চা করতেন। কিশোর বয়সে রবীন্দ্রনাথের সংগীত শিক্ষায় সর্বাধীক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তার দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। এগারো বছর বয়সে লেখা 'গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে' গানটি সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ রচিত প্রথম গান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক মোট গানের সংখ্যা ২২৩২। রবীন্দ্রনাথের সকল গান গীতবিতান নামক সংকলন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর গানগুলিকে পূজা, স্বদেশ, প্রেম, প্রকৃতি, বিচিত্র, ও আনুষ্ঠানিক এই ছয়টি পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছিলেন। এরপর ৭০ বছর ধরে তিনি নিয়মিত গান রচনা করে গিয়েছিলেন।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬ খ্রি.)

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ খ্রি. ২৪ মে (১১ জৈষ্ঠ ১৩০৬ বঙ্গাব্দ) ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলয়া গ্রামে এক বাঙালি মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহ কাজী আমিন উল্লাহ্, পিতা কাজী ফকির আহমদের দ্বিতীয় স্ত্রী জাহেদা খাতুনের ষষ্ঠ সন্তান কাজী নজরুল ইসলাম। কাজী নজরুল ইসলামের ডাক নাম দুখু মিয়া। পিতা কাজী ফকির আহমদ ছিলেন স্থানীয় মসজিদের ইমাম। নজরুল ছোটবেলায় মসজিদের মুয়াজ্জিনের কাজ করতেন এবং মক্তবে কুরআন, ইসলামী ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন অধ্যয়ন শুরু করেন। নয় বছর বয়সে পিতার মৃত্যু হলে অভাব-অনটনের কারণে তাঁর শিক্ষা জীবন বাধাগ্রস্থ হয়। এসময় তিনি মক্তবে নিম্ন-মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সেখানেই শিক্ষকতা শুরু করেন। অভাব-অনটনের কারণে তিনি কখনো রেলওয়ের খানসামার কাজ করেছেন আবার আসানসোলে চা-রুটির দোকানেও কাজ করতে হয়েছে তাঁকে। পারিবারিক এবং পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলের কারণে তিনি অল্প বয়সেই ইসলামিক আচার-অনুষ্ঠানের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পান এবং পরবর্তীতে তাঁর সাহিত্যকর্মে এর প্রবল প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সংগীত জগতের সম্রাট। বিদ্রোহী কবি হিসেবেই তিনি খ্যাত তবে তাঁর রচনায় সাম্য, প্রেম, দর্শন, ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতা স্থান পেয়েছে সমভাবে। ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি লোকশিল্পের প্রতিও আগ্রহ ছিল প্রবল। তিনি বাল্য বয়সেই বাংলার রাঢ় অঞ্চলের কবিতা, গান, নৃত্য ও বাদ্যযন্ত্রের সংমিশ্রণে ভ্রাম্যমান নাট্যদল লেটোতে যোগ দেন। নজরুলের কবি ও শিল্পী জীবনের শুরু এই লেটো দল থেকেই। এখানে তিনি অভিনয় করতেন আবার পালাগানের জন্য কবিতা ও গান লিখতেন। এসময়ে তিনি তার দলের পালাগানের জন্য বেশকিছু লোকসংগীত রচনা করেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য চাষার সং, শকুনীবধ, দাতা কর্ণ, আকবর বাদশাহ্ ইত্যাদি। নজরুল কালীদেবীকে নিয়েও প্রচুর

শ্যামা সংগীত রচনা করেছেন। একদিকে মসজিদ, মাজার ও মক্তব জীবন অন্যদিকে লোকসাহিত্য লেটো দল আবার শ্যামা সংগীত নজরুলের সাহিত্যে এনেছে বৈচিত্র্যময়তা।

১৯১৭ সালে নজরুল সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। তিনি আড়াই বছর সেনাবাহিনীতে কাজ করেন। এসময়ে তিনি ৪৯ বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার পর্যন্ত হয়েছিলেন। এই রেজিমেন্ট্রের পাঞ্জাবী মৌলভীর কাছে তিনি ফার্সি ভাষা শেখেন এবং সংগীতানুরাগী সৈনিকদের সাথে দেশি-বিদেশী বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সংগীত চর্চা অব্যাহত রাখেন। সেনাবাহিনীতে থাকাকালীন নজরুল যে সমস্ত সাহিত্য রচনা করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্যঃ বাউন্ডুলের আত্মকাহিনী, হেনা, ব্যথার দান, মেহের নিগার ঘুমের ঘরে ইত্যাদি। ১৯২০ সালে নজরুল কিছুদিন সাংবাদিকতাও করেন। তিনি মোসলেম ভারত, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, উপাসনা ইত্যাদি পত্রিকায় তার লেখা প্রকাশিত হয়। তৎকালীন কলকাতার দুটি জনপ্রিয় সাহিত্যিক আসর গজেনদার আড্ডা এবং ভারতীয় আড্ডায় অংশগ্রহণের সুবাদে পরিচিত হন অতুলপ্রসাদ সেন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শিশির কুমার ভাদুড়ী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নির্মেলন্দু লাহিড়ী, ধুর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্র কুমার রায়, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ওস্তাদ করমতুল্লা খাঁ প্রমুখের সাথে। ১৯২১ সালের অক্টোবর মাসে তিনি শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তখন থেকে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু পর্যন্ত তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় ছিল। কাজী মোতাহার হোসেনের সাথে নজরুলের বিশেষ বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। নজরুলের গানের সংখ্যা চার হাজারের অধিক। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গানের সুরও নজরুল নিজেই করতেন। নজরুলের গান নজরুল সঙ্গীত নামে পরিচিত। ১৯২৮ সালে গ্রামোফোন কোম্পানি এবং ১৯৩৮ সালে কাজী নজরুল ইসলাম কলকাতা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হন। কলকাতা বেতার কেন্দ্রে তিনটি অনুষ্ঠান যথাক্রমে ‘হারামণি’, ‘নবরাগ মালিকা’ ও ‘গীতিবিচিত্রা’র জন্য তাকে প্রচুর গান লিখতে হতো। তাঁর গানের উল্লেখযোগ্য সংকলন হলো ‘বুলবুল, নজরুল গীতিকা, গুলবাগীচা, গীতি শতদল, নজরুল সংগীত সম্ভার ইত্যাদি।

উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ (১৮৬২ - ১৯৭২)

বিশ্ববরেণ্য সংগীতজ্ঞ উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর জন্ম তৎকালীন ত্রিপুরা প্রদেশের শিবপুর গ্রামে যা বর্তমানে বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগরে অবস্থিত। বাবা আলাউদ্দিন খান নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন। সেতার ও সানাই এবং রাগ সংগীতে বিখ্যাত ঘরানার গুরু হিসাবে সারাবিশ্বে তিনি প্রখ্যাত। মূলত সরোদই তাঁর শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বাহন হলেও সাক্সোফোন, বেহালা, ট্রাম্পেটসহ আরও অনেক বাদ্যযন্ত্রে তাঁর যোগ্যটা ছিল অপরিসীম। আলাউদ্দিনের পরামর্শ ও নির্দেশে কয়েকটি নতুন বাদ্যযন্ত্র উদ্ভাবিত হয়। সেগুলির মধ্যেও ‘চন্দ্রসারং’ ও ‘সুরশৃঙ্গার’ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি অনেক রাগ-রাগিণীও সৃষ্টি করেন, যেমনঃ হেমন্ত, দুর্গেশ্বরী, মেঘবাহার, প্রভাতকেলী, হেম-বেহাগ, মদন-মঞ্জরী, মোহাম্মদ (আরাধনা), মান্ঝ খাম্বাজ, ধবলশ্রী, সরস্বতী, ধনকোশ, শোভাবতী, রাজেশ্রী, চন্ডিকা, দীপিকা, মলয়া, কেদার মান্ঝ, ভুবনেশ্বরী ইত্যাদি। তিনি স্বরলিপিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বহুসংখ্যক যোগ্য শিষ্য তৈরি তাঁর অপর কীর্তি। তাঁর সফল শিষ্যদের মধ্যে তিমিরবরণ, পুত্র আলী আকবর খান, জামাতা পন্ডিত রবিশঙ্কর, ভ্রাতুষ্পুত্র বাহাদুর হোসেন খান, কন্যা রওশন আরা বেগম (অন্নপূর্ণা), পন্ডিত যতীন ভট্টাচার্য, পান্নালাল ঘোষ, পৌত্র আশীষ খান ও ধ্যানেশ খান, খুরশীদ খান, শরণরাণী, ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য, দ্যুতিকিশোর আচার্য চৌধুরী, যামিনীকুমার চক্রবর্তী, রণেন শচীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্যামকুমার গাঙ্গুলী, শ্রীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। মাইহার রাজ্যে, মাইহার কলেজ অব মিউজিক প্রতিষ্ঠা তাঁর সঙ্গীত জীবনের এক শ্রেষ্ঠ অবদান।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩ - ১৯১৩)

বিশিষ্ট বাঙালি কবি, নাট্যকার ও সংগীতস্রষ্টা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ডি এল রায় নামেই পরিচিত ছিলেন। তাঁর লেখা গান বাঙলা সংগীত জগতে দ্বিজেন্দ্রগীতি নামে পরিচিত। তাঁর বিখ্যাত গান 'ধনধান্য পুষ্প ভরা' অত্যন্ত জনপ্রিয়। তিনি প্রায় পাঁচশ' গান রচনা করেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৮৬৩ সালের ১৯ জুলাই ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকে তিনি ভালো গান গাইতে পারতেন। ভালোবাসতেন গাছপালা, ফুল, পাখি আর প্রাকৃতিক দৃশ্য। হুগলী কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করার পর থেকেই তিনি কবিতা, প্রবন্ধ এবং গান লিখতে শুরু করেন। সবার কাছে তা প্রশংসাও পায়। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এম. এ. পাশ করার পর তিনি সরকারি বৃত্তি পেয়ে কৃষিবিদ্যায় পড়ার জন্যে লন্ডনে যান এবং ডিগ্রি অর্জন করেন। সেখানে তিনি পাশ্চাত্য সংগীতও শেখেন। দেশে ফিরে এসে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরিতে যোগ দেন। ডি এল রায়ের কবিতা ও গানে স্বদেশপ্রেম মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ: আষাঢ়ে, হাসির গান, আলেখ্য। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক: সাজাহান, নূরজাহান, সোহরাব-রুস্তম, সিংহল বিজয়, পুনর্জন্ম ইত্যাদি। ১৯১৩ সালের ১৭ মে তিনি পরলোকগমন করেন।

আব্বাসউদ্দিন আহমেদ (১৯০১- ১৯৫৯)

আব্বাসউদ্দিন আহমেদ ছিলেন একজন বিখ্যাত লোকসংগীত শিল্পী, সংগীত পরিচালক ও সুরকার। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কুঁচবিহার জেলায় বলরামপুর গ্রামে ১৯০১ সালে ২৭ অক্টোবর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। থিয়েটার ও স্কুল কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান শুনে তিনি গানের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং নিজের চেষ্টায় গান গাওয়া শুরু করেন। পরে ওস্তাদের কাছে সংগীতে তালিম গ্রহণ করেন। ছাত্রজীবনে তিনি কাজী নজরুল ইসলামের সংস্পর্শে আসেন এবং সংগীত জগতে প্রবেশ করেন। তিনি নজরুলের লেখা ইসলামী গান গেয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তার কিছু অবিস্মরণীয় গান হলো- ও মোর রমজানের ঐ রোজার শেষে; ওকি গাড়িয়াল ভাই ইত্যাদি। এছাড়া তিনি ভাওয়াইয়া, ক্ষীরোল, চটকা এবং পালা-গানকে অভিজাত সংগীতের দরবারে আনেন। তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার তাঁকে 'প্রাইড অব পারফরমেন্স' সম্মানে ভূষিত করে। এছাড়া তিনি মরণোত্তর শিল্পকলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৯) এবং বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান 'স্বাধীনতা পুরস্কার' -এ (১৯৮১) ভূষিত হন। ১৯৫৯ সালের ৩০ ডিসেম্বর তিনি পরলোকগমন করেন।

আবদুল আলীম (১৯৩১-১৯৭৪)

বিখ্যাত পল্লীগীতি শিল্পী আবদুল আলীমের জন্ম মুর্শিদাবাদে ২৭ জুলাই ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে। ছোটোবেলা থেকেই তিনি সংগীতের প্রবল অনুরাগী ছিলেন। তখন থেকেই গ্রামোফোন রেকর্ডের গান শুনে শিখে নিতেন এবং পালা-পার্বনে গাইতেন। পরবর্তী সময়ে লোকসংগীতে এবং শাস্ত্রীয় সংগীতে মূলত কানাইলাল শীল এবং সৈয়দ ওয়ালিউল ইসলামের কাছে তালিম গ্রহণ করেন। কলম্বিয়া, হিজ মাস্টার্সে ভয়েস, গ্রামোফোন কোম্পানি অব পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে তাঁর অসংখ্য রেকর্ড বের হয়েছে। তিনি ঢাকার সংগীত মহাবিদ্যালয়ে পল্লীগীতি বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। তিনি ১৯৭৭ সালে মরণোত্তর 'একুশে পদ' এবং ১৯৯৭ সালে মরণোত্তর 'স্বাধীনতা পুরস্কার' লাভ করেন। আবদুল আলীম ১৯৭৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বর ঢাকার পিজি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

ওস্তাদ মুন্সী রইসউদ্দিন (১৯০১-১৯৭৬)

ওস্তাদ মুন্সী রইসউদ্দিন মাগুরা জেলার নাকোল গ্রামে ১০ জানুয়ারি ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। খুব ছোটোবেলা থেকে তিনি সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হন। ফুফাতো ভাই শামসুল হকের কাছে তিনি সংগীতের প্রথম

সেশন নেন। ম্যাট্রিক পাশ করার পর তিনি চাকরির উদ্দেশে কোলকাতা যান। সেখানে কিছুদিন চাকরি করেন এবং প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ রাসবিহারী মল্লিকের কছে ১২ বছর ধ্রূপদ ও খেয়াল শিক্ষালাভ করেন। তারপর প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী পরিচালিত সংগীতকলা ভবনে ভর্তি হয়ে উচ্চাঙ্গ সংগীতে সার্টিফিকেট লাভ করেন। ১৯৫৫ সালে ওস্তাদ মুন্সী রইসউদ্দিন বুলবুল ললিতকলা একাডেমির সহ অধ্যক্ষ এবং ১৯৬৪ সালে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। সংগীত শিক্ষার্থীদের কাছে সংগীতকে সহজবোধ্য করে তোলার জন্য তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে অভিনব শতরাগ, ছোটোদের সারেগামা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৭ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার তাঁকে 'প্রাইড অব পারফরন্সে' সম্মানে ভূষিত করে। ১৯৮৬ সালে তাঁকে মরণোত্তর 'একুশে পদক' প্রদান করা হয়। ১৯৭৬ সালের ১১ এপ্রিল তিনি পরলোকগমন করেন।

আলতাফ মাহমুদ (১৯৩৩-)

প্রখ্যাত সুরকার, সংস্কৃতি কর্মী এবং শহিদ মুক্তিযোদ্ধা আলতাফ মাহমুদের জন্ম বরিশাল জেলার মুলাদি উপজেলার পাতারচর গ্রামে। বরিশাল জিলা স্কুলে পড়ার সময় সংগীতে তাঁর হাতেখড়ি হয়। ম্যাট্রিক পাশ করার পর তিনি চিত্রকলা শেখার জন্য ক্যালকাটা আর্ট স্কুলে ভর্তি হন। প্রথমে সেখানকার প্রখ্যাত বেহালা বাদক সুরেন রায়ের কাছে সংগীতে তালিম নেন। পরে প্রখ্যাত উচ্চাঙ্গ সংগীতজ্ঞ ওস্তাদ আবদুল কাদের খাঁর কাছে তালিম নেন। দেশে ফিরে তিনি গানে সুরারোপ করতে থাকেন। তিনি একজন ভাষাসৈনিক ছিলেন এবং শহিদ দিবস নিয়ে রচিত 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটির বর্তমান সুর তাঁরই করা। এই গানটির জন্য তিনি বাংলাদেশের জনগনের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি একজন সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তাঁর বাসায় মুক্তিযোদ্ধাদের একটি গোপন ক্যাম্প করা হয়েছিল এবং প্রচুর গোলাবারুদ তিনি তাঁর বাগানে মাটির নিচে লুকিয়ে রেখেছিলেন। এসব ঘটনা জানাজানি হয়ে গেলে ১৯৭১ সালের ৩০ আগস্ট মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আলতাফ মাহমুদকে ঢাকার আউটার সাকুলার রোডের বাসা থেকে চোখ বেঁধে কোথাও নিয়ে যায়, পরে তাঁর আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

অংশ খঃ সংগীতে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র

বাদ্যযন্ত্র সঙ্গীতোপযোগী শব্দ সৃষ্টিকারী যন্ত্র। যে যন্ত্রকে বা বস্তুকে আঘাত করলে সুরসহ শব্দ বা আওয়াজ বের হয় তাকে বলে বাদ্যযন্ত্র। এগুলি কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়।

বাদ্যযন্ত্র সাধারণত চার প্রকার। যথা:

১) **তার বা তত যন্ত্রঃ** সেতার, সরজ, এসরাজ, সুরবাহার, বেহালা, তানপুরা, সারেঙ্গী ইত্যাদি।

২) **শুষির বা ফুৎকার যন্ত্রঃ** বাঁশি, সানাই ইত্যাদি।

৩) **ঘন যন্ত্রঃ** মন্দিরা, করতাল, কাঁসা, জুড়ি, জিপসি ইত্যাদি।

৪) **আনদ্ধ যন্ত্রঃ** তবলা বায়া, ঢোল, খোল, মাদল ইত্যাদি।

সহায়ক তথ্য-১৪	জাতীয় সংগীত অনুশীলন

অংশ-ক	জাতীয় সংগীত এর বিষয়বস্তু

জাতীয় সংগীত একটি জাতির পরিচয়বাহী দেশাত্মবোধক গান। বিশ্বের সকল দেশেরই জাতীয় সংগীত আছে। জাতীয় সংগীতে জাতির প্রকৃতি, পরিচয়, ঐতিহ্য, ইতিহাস, সংগ্রাম ও দেশটির প্রতি নাগরিকের মমত্ববোধের অনুভূতি ফুটে ওঠে। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত রচনা করেছেন কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই গান আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। স্বাধীনতার পর 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটির প্রথম দশ চরণ বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতরূপে গৃহীত হয়।

গানটিতে জন্মভূমিকে 'মা' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। গানটিতে বাংলা মায়ের একটি মমতাময়ী রূপ ফুটে উঠেছে। বাংলার আকাশ, বাতাস, ফুল, ফল, ফাগুনের আমের মুকুল, নদীর কূলে বটের ছায়ায় প্রশান্তি, স্নেহ-মায়ায় বাংলা যেন মায়ের একটি আঁচল- কবির বাণীতে অসাধারণ রূপ লাভ করেছে। আমাদের দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দিনের কার্যক্রম শুরু হওয়ার আগে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়।

অংশ-খ	জাতীয় সংগীতের বাণী

জাতীয় সংগীত- আমার সোনার বাংলা

কথা ও সুরঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তাল: দাদরা

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।

চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।।

ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,

মরি হায় হায় রে-

ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।।

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো-

কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে ।

মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,

মরি হায়, হায় রে-

মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়ন জলে ভাসি।।

সহায়ক তথ্য-১৫	লোক সংগীত ও ছড়া গান অনুশীলন

অংশ-ক	লোক সংগীত ‘কলকল ছলছল’-এর বিষয়বস্তু ও বাণী

গানের বিষয়বস্তু:

গানের দেশ বাংলাদেশ। নদীর দেশ বাংলাদেশ। নদীর বয়ে যাওয়ার শব্দে আর ঢেউয়ের কলকল ধ্বনিতে খুঁজে পাওয়া যায় ছন্দ আর সুর। তাই নৌকার মাঝি গেয়ে ওঠে গান। আবার মাঝিকে কল্পনা করে রচিত হয় অনেক গান। ভাটি অঞ্চলের গানগুলো ভাটিয়ালি গান নামেই পরিচিত। ভাটিয়ালি সুরে এই অঞ্চলে অনেক পল্লীগীতি রচিত হয়েছে এবং জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তেমনি একটি গান ‘কলকল ছলছল নদী করে টলমল...’ গানটি কাহারবা তালে নিবদ্ধ। ৪+৪ মাত্রায় বিভক্ত।

গানের বাণী:

কলকল ছলছল নদী করে টলমল
ঢেউ ভাঙে ঝড় তুফানেতে,
নাও বাইও না মাঝি বিষম দইরাতে।।

ওরে গগনে গগনে হুংকারিয়া ছোটে মেঘ,
শন শন বায়ু বয় চৌদিকে।
মাঝি নিমিষে গুটাইও পাল সামলে ধরিও হাল
ধীরে ধীরে পাড়ি দিও বৈঠাতে।।

বদর বদর বলি, কিনারে কিনারে চলি,
ভাটি গাঙে ভাটিয়াল গাইও
থাকিলে জোয়ার দেরি, লগি মাইরো তাড়াতাড়ি
বেলাবেলি ঘাটে ফিরা আইও।।

থাকি চাহিয়া চাহিয়া পথের পানে তালাশে
দুরু দুরু কাঁপে হিয়া নৈরাশে।
মোরে কূলে রাইখা বারবার না যাইও গাঙেতে আর
সাথে সাথে নিও তুলি নৌকাতে।।

অংশ-খ	ছড়া গান ‘আমরা সবাই রাজা’ -এর বিষয়বস্তু ও বাণী

গানের বিষয়বস্তুঃ

‘আমরা সবাই রাজা’ গানটির মাধ্যমে শিশু মনে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা সম্পৃতি ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভাব জাগ্রত করার চেষ্টা রয়েছে। এই গানে গণতান্ত্রিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। সবাইকে সাথে নিয়ে, সবাইকে সম্মান ও গুরুত্ব দিয়ে রাজ্য শাসন করলে সেক্ষেত্রে রাজা ব্যর্থ হয় না। সেটি আবারও তার কাছে ফিরে আসে। জনতার প্রতিনিধি এবং জনতার সাথে অভিন্ন মত তৈরির রাষ্ট্রের জন্যে কল্যাণকর। জনগণকে সম্মান দিলে প্রকৃতপক্ষে রাজাই সম্মানিত হন। পরমত সহিষ্ণুতার চমৎকার নিদর্শন এই গানে পাওয়া যায়। ছোট-বড় ভেদাভেদের কথা ভুলে গিয়ে একই সূত্রে সবাইকে গাঁথা হয়েছে এখানে। দাস দাসত্বের উর্ধ্বে সকলকে একই মন্ত্রে দীক্ষিত করার প্রয়াস পেয়েছে গানটিতে। রাজপ্রজা, ধনি-দরিদ্র, উঁচু-নিচু ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সকলকে সমমানের মনে করেছেন। যার যার নিজস্ব ঢং-এ আলাদা ব্যক্তি সত্তার গুরুত্ব দিয়ে রচিত হয়েছে গানটি। এই গানের মধ্য দিয়ে সকলের সমঅধিকারের কথা বলা হয়েছে।

গানের বাণীঃ

গানঃ আমরা সবাই রাজা
কথা ও সুরঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
তালঃ দাদরা

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে-
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।।
আমরা যা খুশি তাই করি,
তবু তার খুশিতেই চরি,
আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে-
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।।
রাজা সবারে দেন মান,
সে মান আপনি ফিরে পান,
মোদের খাটো করে রাখেনি কেউ কোন অসত্যে-
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।।

সহায়ক তথ্য-১৬	নৈতিক শিক্ষামূলক ও উদ্দীপনামূলক গান অনুশীলন

অংশ-ক	নৈতিক শিক্ষামূলক গানের বিষয়বস্তু ও বাণী

গানের বিষয়বস্তু:

এই গানটি মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-১৮৫৮) এর একটি বহুল-পঠিত কবিতার সমকালীন সুরারোপ। মদনমোহন উনিশ শতকের বাংলা বর্ণমালা, বাংলায় পাঠ্য বই প্রণয়ন এবং ভাষা ও সাহিত্য বিকাশের কাঠামো নির্মাণের পথে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গী। মদনমোহন প্রথমে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে অধ্যাপনা করেন এবং পরে মুর্শিদাবাদ জেলার বিচারক হিসেবে কাজ করেন। এই গানটিতে একজন শিশুকে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে যে গুণাবলি দরকার, তা আয়ত্তে আনার উপর জোর দিয়ে একটি রূপরেখা উপস্থাপন করেছেন কবি। যেমন: গুরুজনের কথা মেনে যেন চলি, ভাইবোন মিলেমিশে যেন এক সঙ্গে থাকি। একসঙ্গে থাকতে হলে ঝগড়া বিবাদ করা যাবে না। অন্যের জিনিসের প্রতি লোভ করা যাবে না, মিথ্যা বলা যাবে না এবং অন্যের প্রতি ঈর্ষান্বিতও হওয়া যাবে না। আবার পড়াশোনা যেমন করতে হবে, তেমনি খেলাধুলাও করতে হবে। তবে অবশ্যই মিশতে হবে ভালোদের সাথে। কবিতার কথাগুলো একজন আদর্শ মানুষ তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে বলে গান-আকারে পাঠ্য তালিকায় নিয়ে আসা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, সুরের মাধ্যমে কথাগুলো শিশু মনে দিতে পারলে তা স্থায়িত্ব লাভ করে। তাই আশা করা যায়, গানটি গাইতে গাইতে শিশুর মানস গঠন প্রক্রিয়ায় একটি আদর্শের ছাপ অঙ্কিত হবে। গানটি কাহারবা তালে নিবদ্ধ। ৪+৪ মাত্রায় বিভক্ত।

গানের বাণী:

গান: সকালে উঠিয়া আমি
কথা ও সুর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
তাল: দাদরা

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,
সারা দিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।
আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে,
আমি যেন সেই কাজ করি ভালো মনে।
ভাইবোন সকলেরে যেন ভালোবাসি,
এক সাথে থাকি যেন সবে মিলেমিশি।
ভালো ছেলেদের সাথে মিশে করি খেলা,
পাঠের সময় যেন নাহি করি হেলা।
সুখী যেন নাহি হই আর কারো দুখে,
মিছে কথা কভু যেন নাহি আসে মুখে।
সাবধানে যেন লোভ সামলিয়ে থাকি,
কিছুতে কাহারে যেন নাহি দেই ফাঁকি।
ঝগড়া না করি যেন কভু কারো সনে,
সকালে উঠিয়া এই বলি মনে মনে।।

অংশ-খ	উদ্দীপনামূলক গান এর বিষয়বস্তু ও বাণী

গানের বিষয়বস্তুঃ

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় কবি। কথা ও সুরের অসাধারণ বৈচিত্রের সমন্বয় ঘটিয়েছেন তিনি তার সংগীতে। সংগীতের বিভিন্ন শাখায় তাঁর সাবলীল পদচারণা। শিশুদের নিয়ে রচনা করেছেন বিচিত্র রকমের গান। যেখানে রয়েছে বাধাবন্ধনহীন ছুটে চলার প্রেরণা ও জীবনী শক্তি। এ গানটির মাধ্যমে শিশুরা তাদের অন্তরের উদ্যম ও অবিরাম ছুটে চলার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। গানটির তাল দাদরা, ছয় মাত্রা।

গানের বাণীঃ

গানঃ ঝঞ্ঝার মত উদ্দাম

কথা ও সুরঃ কাজী নজরুল ইসলাম

তালঃ দাদরা

মোরা ঝঞ্ঝার মত উদ্দাম, মোরা ঝর্ণার মত চঞ্চল।
মোরা বিধাতার মত নির্ভয়, মোরা প্রকৃতির মত সচ্ছল।।
আকাশের মত বাঁধাহীন,
মোরা মরু সঞ্চার বেদুঈন,
(মোরা) বন্ধনহীন জন্ম-স্বাধীন, চিত্ত মুক্ত শতদল।।
মোরা সিন্ধুজোয়ার কলকল
মোরা পাগলা-ঝোরার ঝরা জল
কল্ কল্ কল্ ছল্ ছল্ ছল্ কল্ কল্ কল্ ছল্ ছল্ ছল্
মোরা দিল-খোলা খোলা প্রান্তর,
মোরা শক্তি অটল মহীধর
হাসি-গান সম উচ্ছল
মোরা বৃষ্টির জল বনফল খাই, শয্যা শ্যামল বন-তল।।

সহায়ক তথ্য-১৭	নৃত্য শিখন শেখানো কৌশল

অংশ-ক	নৃত্যের ধারণা ও বিষয়বস্তু

সাবলীল, সুললিত ও ছন্দযুক্ত অঙ্গভঙ্গি দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করাকে নৃত্য বলে। মানুষের শরীর নৃত্যের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। মানব শরীরে অনেকগুলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে। মানুষ নানাভাবে এই সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে ছন্দে ছন্দে চালনা করতে সক্ষম। মানুষ সামাজিক প্রাণী, একে অপরের সাথে ভাব বিনিময় করে সামাজিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত। মানুষ যেমন মনের অনুভূতিকে মুখের ভাষায় প্রকাশ করে তেমনি নৃত্যের ভঙ্গিতে নান্দনিকভাবে উপস্থাপন করে মনের ভাব প্রকাশ করে। প্রতিটি মানুষের ভেতরে প্রকৃতিগতভাবে ছন্দবোধ থাকে। ভাষা আবিষ্কারের আগেই মানুষ বিভিন্ন আকার-ইঙ্গিতে অঙ্গ সঞ্চালনার মাধ্যমে ভাব আদান-প্রদান করত। এই দৈহিক ছন্দ এক সময় হয়ে উঠল নৃত্য। নৃত্য মানুষের একটি স্বতঃস্ফুর্ত প্রয়াশ। আপনা আপনিই অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো নানা ছন্দে জেগে ওঠে। সভ্যতার কোনো এক পর্যায়ে নৃত্য হয়ে ওঠে শিল্প বা কলা, যা মানুষের সজ্ঞান নান্দনিক বোধের প্রকাশ।

- নির্বাচিত দেশের গানে নৃত্য
- নির্বাচিত লোকগানের সাথে নৃত্য
- নির্বাচিত ছড়া গানের সাথে নৃত্য
- নির্বাচিত গানে দলগত নৃত্য
- নির্বাচিত নৈতিক শিক্ষামূলক গানের সাথে নৃত্য
- জীবন ও প্রকৃতি সংশ্লিষ্ট নৃত্য
- নীতি, মানবিকতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্পর্কিত তথ্য
- জাতীয় সংগীত, রণ সংগীত, জাতির পিতা, মুক্তিযুদ্ধ, একুশ ও উৎসব বিষয়ক নৃত্য
- বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর নৃত্য
- সমাজ ও প্রকৃতি সংশ্লিষ্ট নৃত্য
- সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতাবোধ সমৃদ্ধ নৃত্য
- দেশাত্মবোধক গানের সাথে নৃত্য
- বিশ্ব সংস্কৃতি নির্ভর নৃত্য

সহায়ক তথ্য-১৮	লোকগানে নৃত্য

অংশ: ক

লোকগানের বাণীর ভিডিও লিংক

https://www.youtube.com/watch?v=w520UualkjA

https://www.youtube.com/watch?v=HQ90awAmQlE

অংশ-খ	লোকগানের গানের বাণী ও ভাবার্থ

কলকল ছলছল নদী করে টলমল
ঢেউ ভাঙ্গে ঝড় তুফানেতে,
নাও বাইও না মাঝি বিষম দইরাতে।।
ওরে গগনে গগনে হুংকারিয়া ছোটে মেঘ,
শন শন বায়ু বয় চৌদিকে।
মাঝি নিমিষে গুটাইও পাল সামলে ধরিও হাল
ধীরে ধীরে পাড়ি দিও বৈঠাতে।।

বদর বদর বলি, কিনারে কিনারে চলি,
ভাটি গাঙ্গে ভাটিয়াল গাইও
থাকিলে জোয়ার দেরি, লগি মাইরো তাড়াতাড়ি
বেলাবেলি ঘাটে ফিরা আইও।
থাকি চাহিয়া চাহিয়া পনথের পানে তালাশে
দুরু দুরু কাঁপে হিয়া নৈরাশে
মোরে কূলে রাইখা বারবার না যাইও গাঙেতে আর
সাথে সাথে নিও তুলি নৌকাতে।।

ভাবার্থ -লোক সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ আমাদের বাংলাদেশ। আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের আচার আচরণ, কথা, পোশাক, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। দেখা যায় পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের সাথে সমতলের মানুষের সাংস্কৃতিক ভিন্নতা আছে। ভিন্নতা আছে ভাটি অঞ্চলের সাথে উত্তরাঞ্চলের। কোথাও ভাটিয়ালি, কোথাও ভাওয়াইয়া, কোথাও পাহাড়ি গানের সুর। এই বৈচিত্রই সমৃদ্ধ করেছে আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে। সংস্কৃতির এই ভিন্ন উপাদানই ভিন্নতার মাঝে নির্মল আনন্দের সৃষ্টি করেছে। ‘কলকলছলছল’ লোকগানটি নদী মাতৃক বাংলাদেশের পরিচিত দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছে। নদীর ঢেউয়ের কলকল ধ্বনি আর ঢেউয়ে বৈঠার আঘাতের ছলছল ধ্বনি মিলে এক অপরূপ ছন্দ তৈরি করেছে। এই ছন্দকেই নৃত্যের ছন্দে শিক্ষার্থীদের সহজ ভাবে দেখানো হবে। এই গানটির সাথে নৃত্যভঙ্গি করার সময় শিক্ষার্থীরা কখন নিজেকে মাঝি হিসাবে কল্পনা করবে ও মাঝিদের মত নৌকা বাওয়ার ভঙ্গি করবে। গানটি লিখেছেন ও সুর করেছেন- এ কে এম আব্দুল আজিজ।

সহায়ক তথ্য-১৯	নাট্যকলা ও অভিনয়

অংশ-ক	নাট্যকলা ও অভিনয় বিষয়ের বিষয়বস্তু

▪	প্রকৃতি ও পরিবেশ
▪	সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য
▪	সৃজনশীলতা
▪	শৃঙ্খলা, শ্রদ্ধা ও মানবতা
▪	শৃঙ্খলা, শ্রদ্ধা, নৈতিকতা ও দায়বদ্ধতা
▪	জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি
▪	চিন্তা ও কল্পনা
▪	নৈতিকতা ও মানবিকতা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ
▪	বাংলাদেশের প্রকৃতি, পরিবেশ ও সমাজ, ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধ
▪	পারস্পারিক সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতা
▪	ইতিহাস ও ঐতিহ্য
▪	শিল্পকলা চর্চার মাধ্যমে নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন

সহায়ক তথ্য-২০	অভিনয়ের প্রাথমিক ধারণা ও প্রয়োগ

অংশ-ক	নাট্যকলা

মানুষের জীবনের ও সমাজের নানা বিষয় নাট্যকলার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। নাট্যকলার প্রধান উপাদান অভিনয় ও অভিনেতা। অভিনয় একটি সৃজনশীল কাজ এবং অভিনেতা একজন সৃজনশীল মানুষ। অভিনয় ক্রিয়া সূচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য যথাযথ শিক্ষা ও প্রস্তুতি থাকা দরকার। অভিনয় একটি কৌশল। এটি শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় প্রয়োগ করলে শিশুর জন্য শেখা আনন্দঘন হয়। শিক্ষায় অভিনয় কৌশল প্রয়োগে শিশুর একঘেয়েমী দূর হয়। শিশুর শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলা, হাঁটাচলা এসব অভিনয়ের মাধ্যমে অর্জন সম্ভব।

পঞ্চম শ্রেণির অবাক জলপান নাটকের পাঠ অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করলে এবং অন্য বিষয়ের পাঠও শিক্ষক নাট্যরূপ দিয়ে শিশুদের দিয়ে উপস্থাপন করালে শিশুরা অনেক আনন্দের সাথে পাঠটি গ্রহণ করবে। বাংলা পাঠ্যপুস্তকের যে বিষয়বস্তুগুলি সংলাপ আকারে দেয়া আছে, সেগুলি শ্রেণিতে অভিনয়ের মত উপস্থাপন করলে শিশুরা আনন্দ পাবে। যেমন- দ্বিতীয় শ্রেণির ‘দাদির হাতের মজার পিঠা’, তৃতীয় শ্রেণির ‘স্বাধীনতা দিবসকে ঘিরে’ ইত্যাদি। বিভিন্ন দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে অভিনয় করা যেতে যাবে।

অংশ-খ	অবাক জলপান নাটকের ভাবার্থ

শিশু কিশোরদের রচনার ক্ষেত্রে সুকুমার রায় অনবদ্য। একটি সাধারণ ঘটনাকেও তাঁর মেধার গুণে তিনি অসাধারণ করে তোলেন। তাঁর রসবোধ মার্জিত ও তুলনাহীন। অবাক জলপান একটি নির্মল হাসির নাটক। নাটকে পথিকের জলতেষ্টা পাওয়ার ঘটনাটি ছিল অতি সাধারণ। কিন্তু তিনি এটিকে অতি গুরুত্বপূর্ণ করে তৈরি করলেন। পথিকের এই জলতেষ্টা পাওয়াকে কেউ কানে তুলছেন না। বরং নিজেদের কথাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উঠেপড়ে লাগেন। নানা উদাহরণ হাজির করেন। শেষে অনেক বুদ্ধি ফন্দি এঁটে বিজ্ঞানীর নিকট থেকে জল আদায় করেন। নাটকের প্রতিটি চরিত্রই সুন্দর ও প্রাণবন্ত। বিদ্যালয়ে নাটকটি মঞ্চস্থ করলে শিক্ষার্থীরা খুব আনন্দ পাবে।

বিটিপিটি প্রশিক্ষণার্থীগণের অঙ্কন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্তরভিত্তিক অনুশীলনমূলক নমুনা চিত্রঃ

নমুনা চিত্র

প্রথম স্তর	দ্বিতীয় স্তর	তৃতীয় স্তর

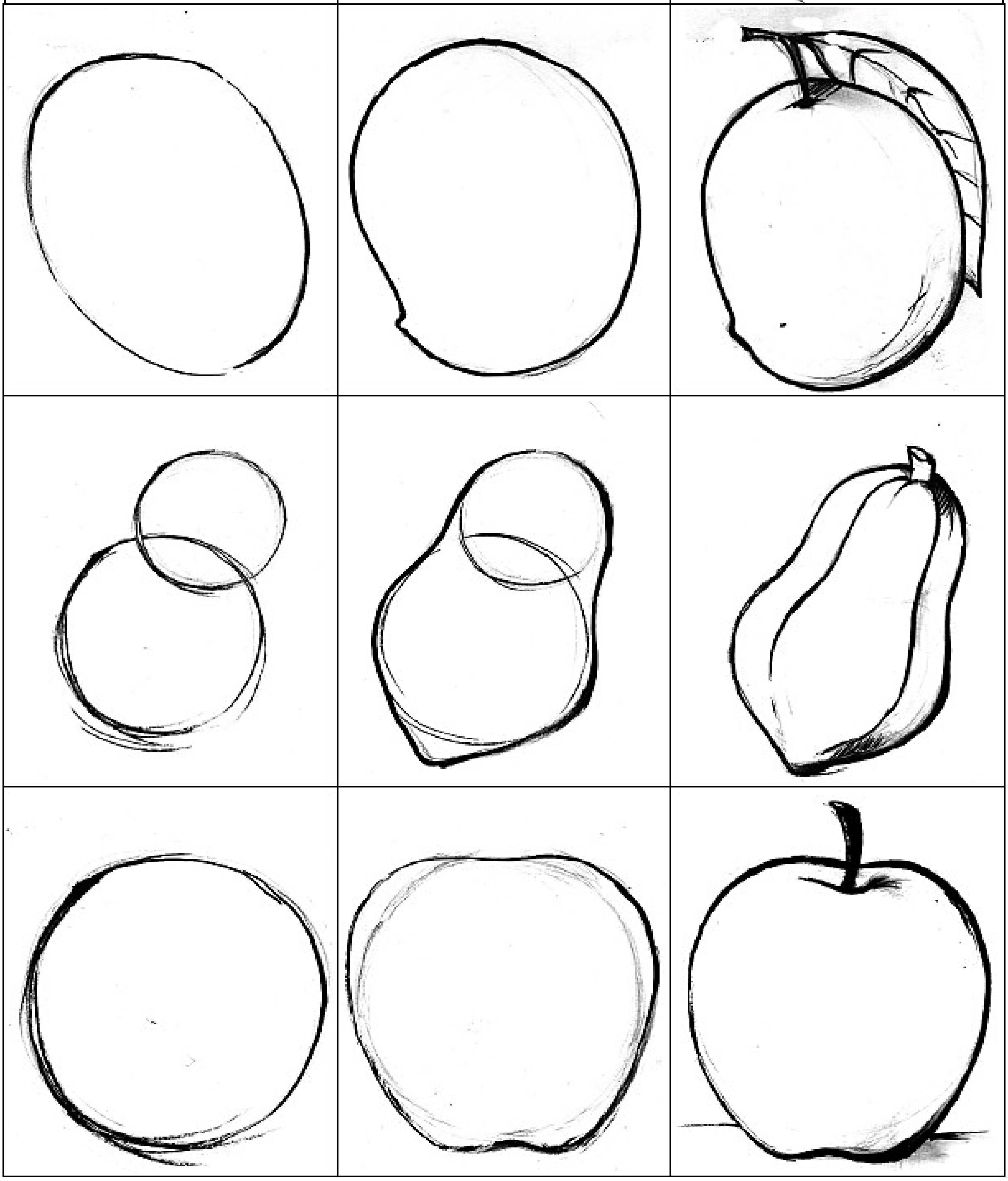

নমুনা চিত্র

প্রথম স্তর	দ্বিতীয় স্তর	তৃতীয় স্তর
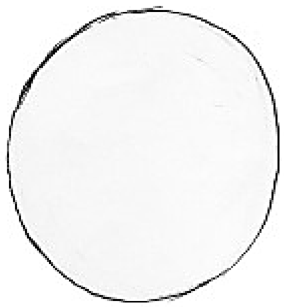	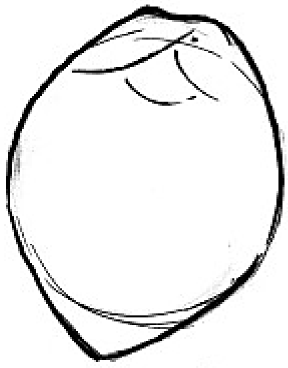	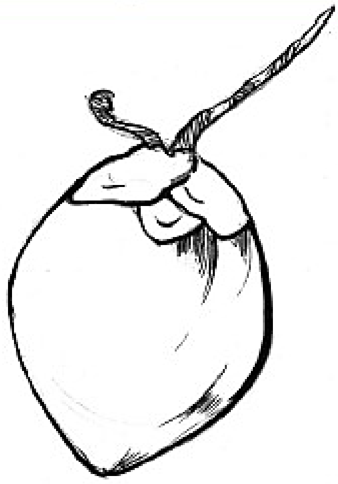
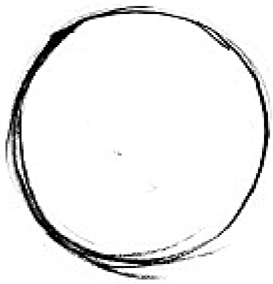	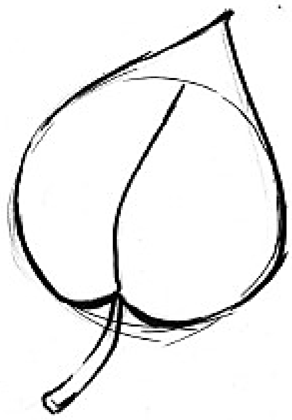	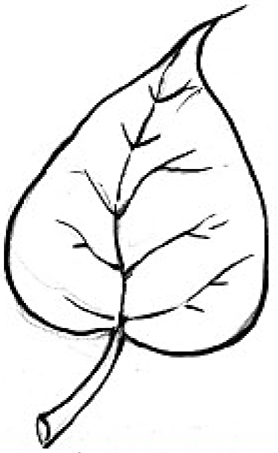
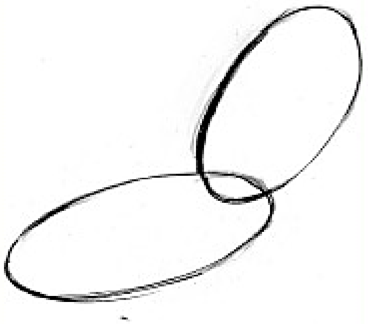	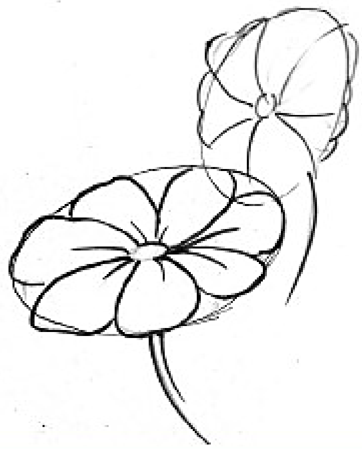	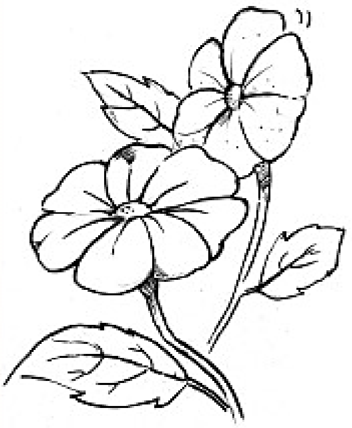

নমুনা চিত্র

প্রথম স্তর	দ্বিতীয় স্তর	তৃতীয় স্তর
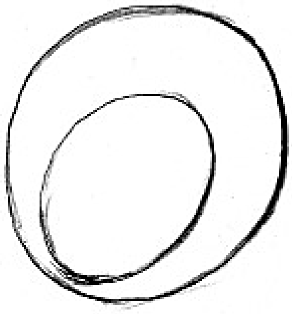		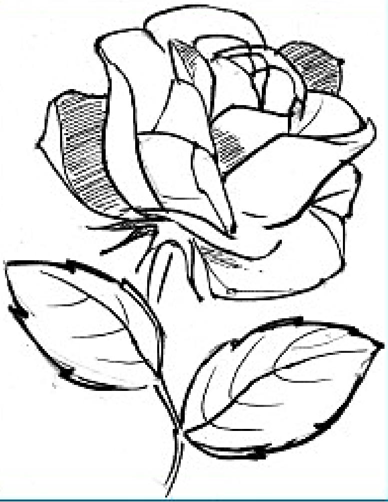
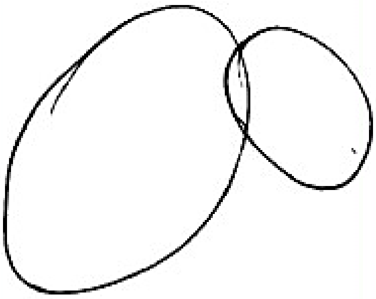	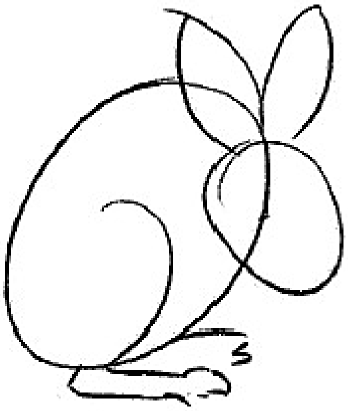	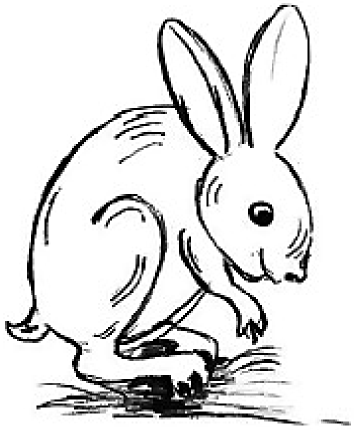
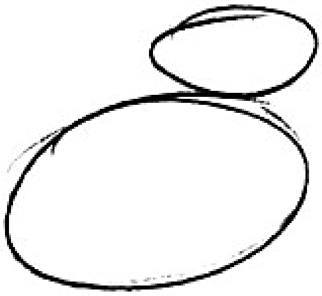	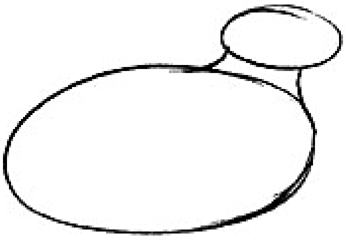	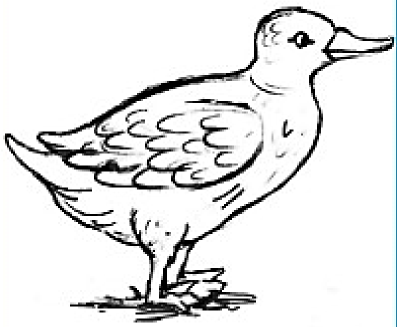

নমুনা চিত্র

প্রথম স্তর	দ্বিতীয় স্তর	তৃতীয় স্তর
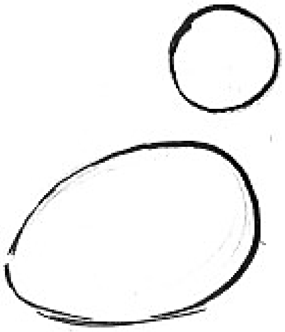	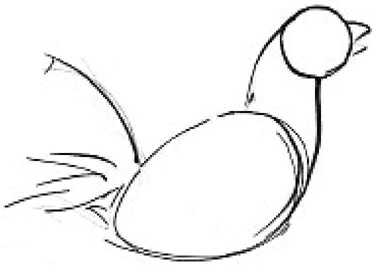	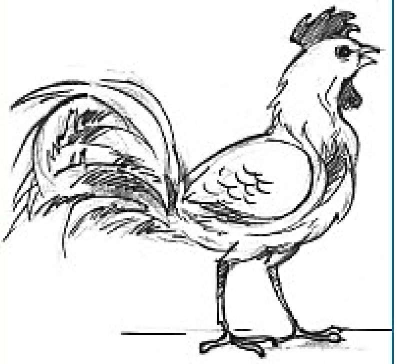
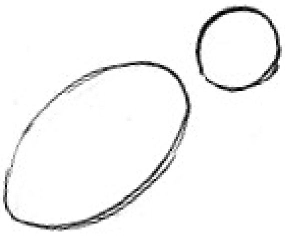	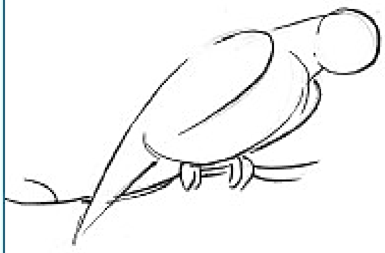	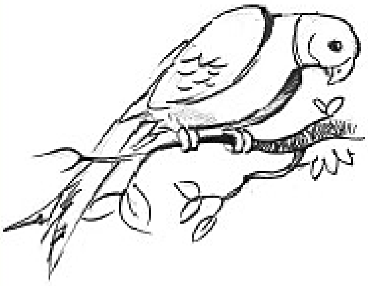
	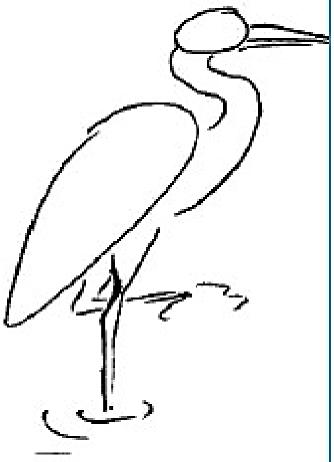	

নমুনা চিত্র

প্রথম স্তর	দ্বিতীয় স্তর	তৃতীয় স্তর
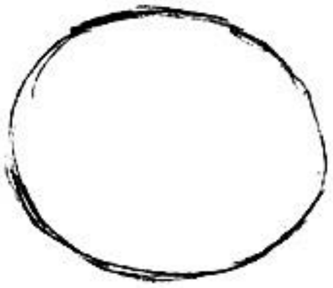		
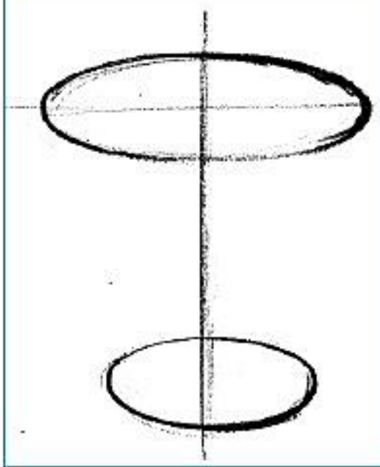	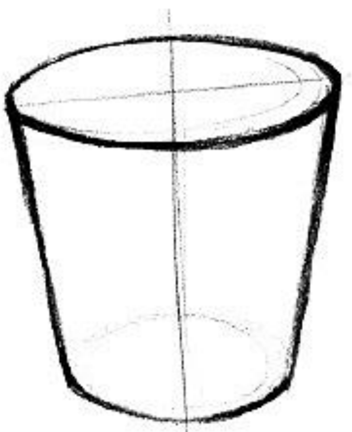	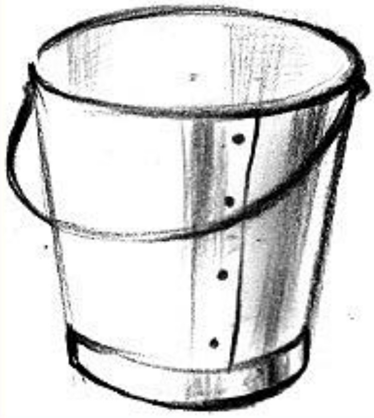
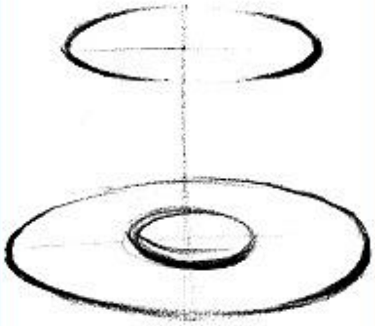	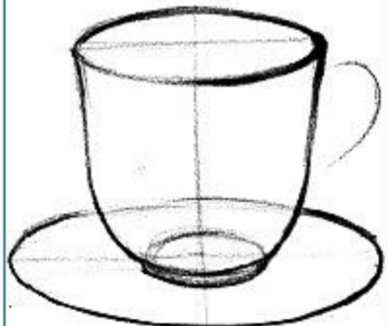	

নমুনা চিত্র

প্রথম স্তর	দ্বিতীয় স্তর	তৃতীয় স্তর
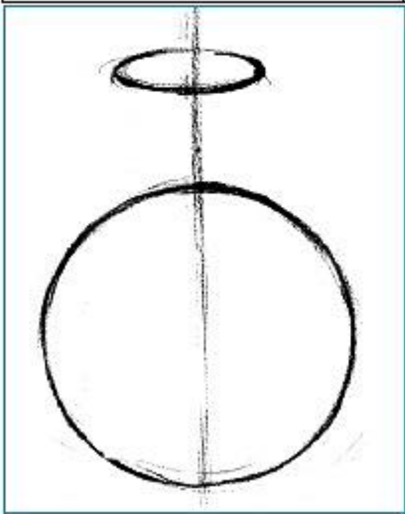	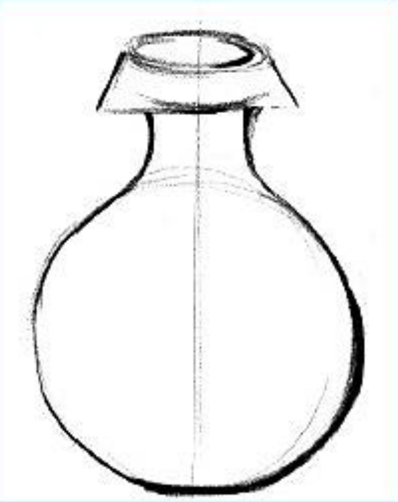	
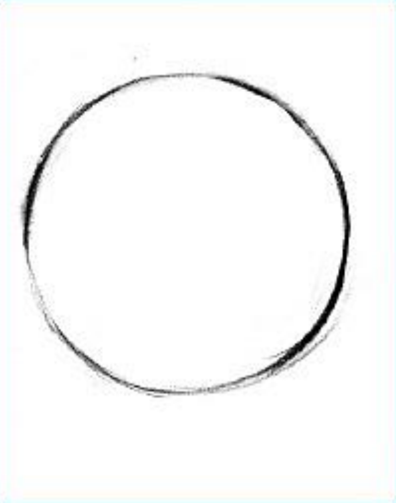		
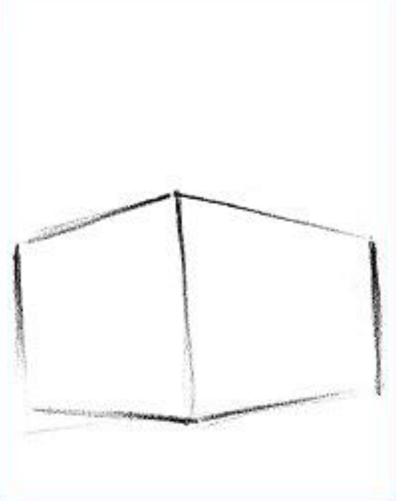	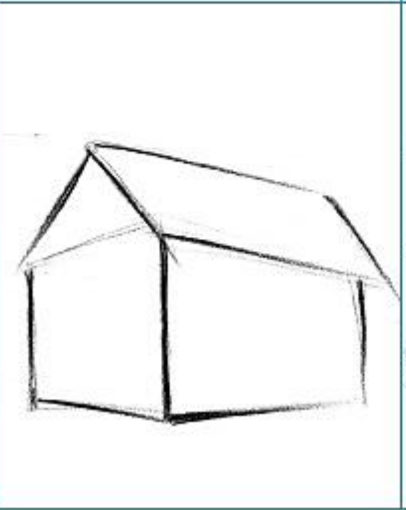	

নমুনা চিত্র

প্রথম স্তর	দ্বিতীয় স্তর	তৃতীয় স্তর
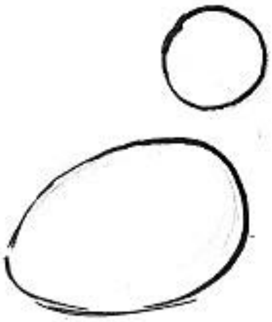	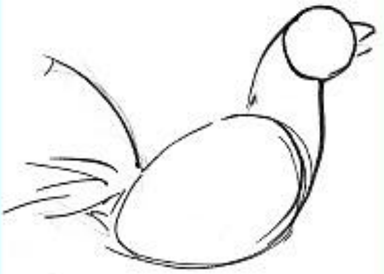	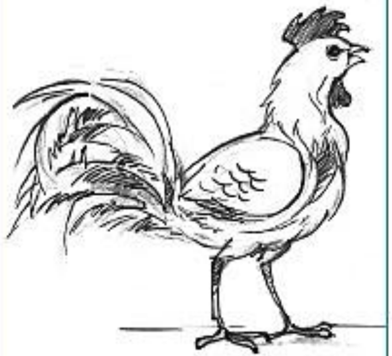
	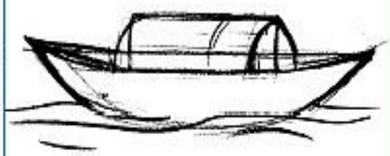	
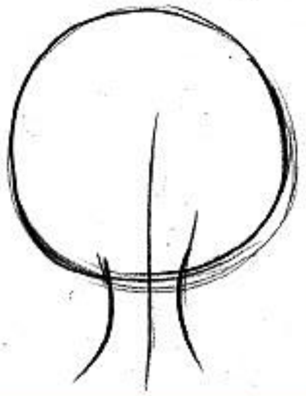		

নমুনা চিত্র

প্রথম স্তর	দ্বিতীয় স্তর	তৃতীয় স্তর
		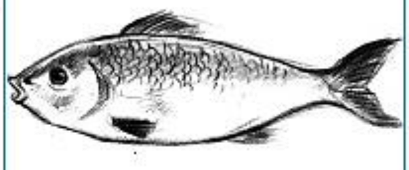

নমুনা চিত্র

প্রথম স্তর	দ্বিতীয় স্তর	তৃতীয় স্তর
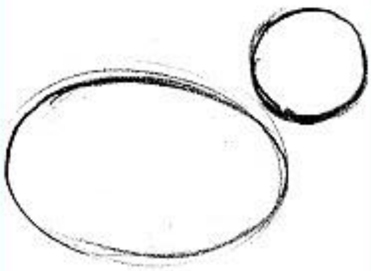	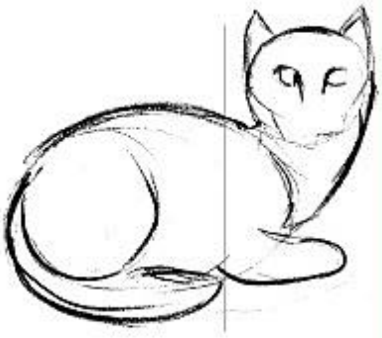	
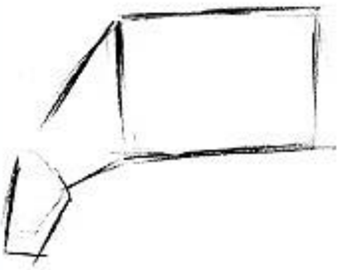	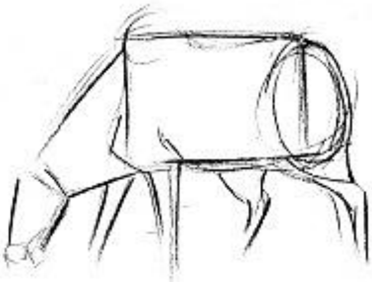	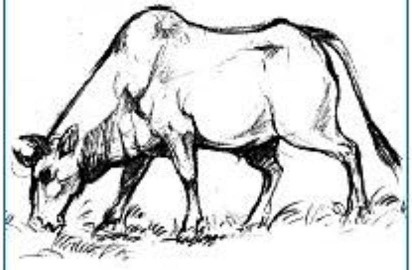
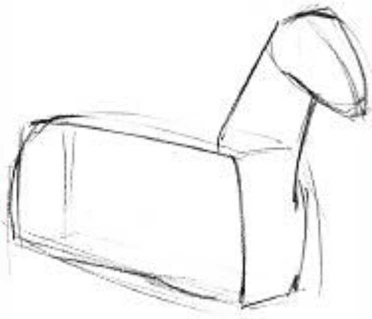	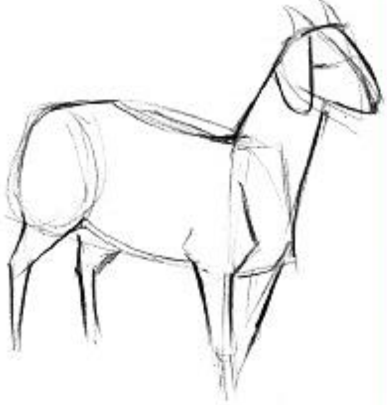	

নমুনা চিত্র

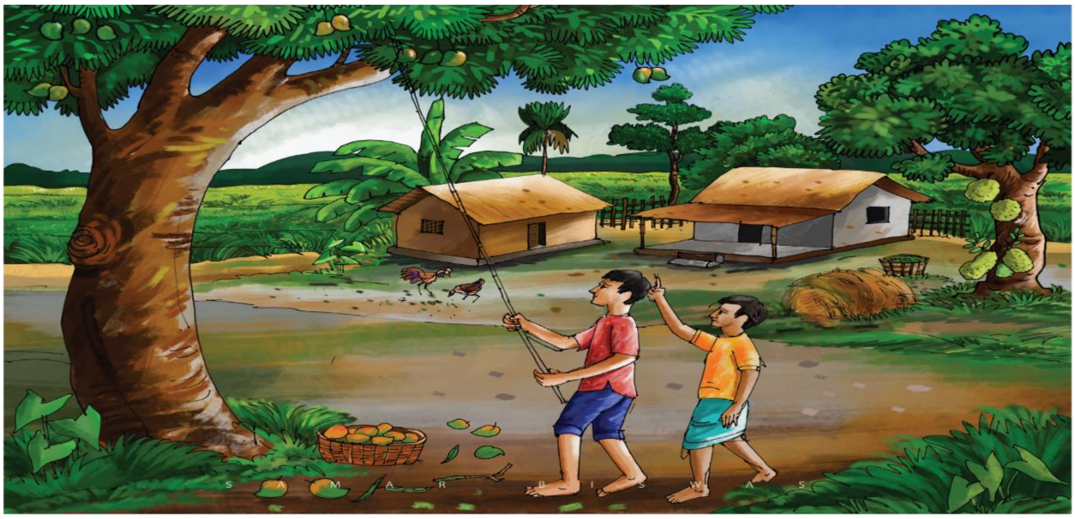
S A M A R B I S W A S

S A M A R B I S W A S

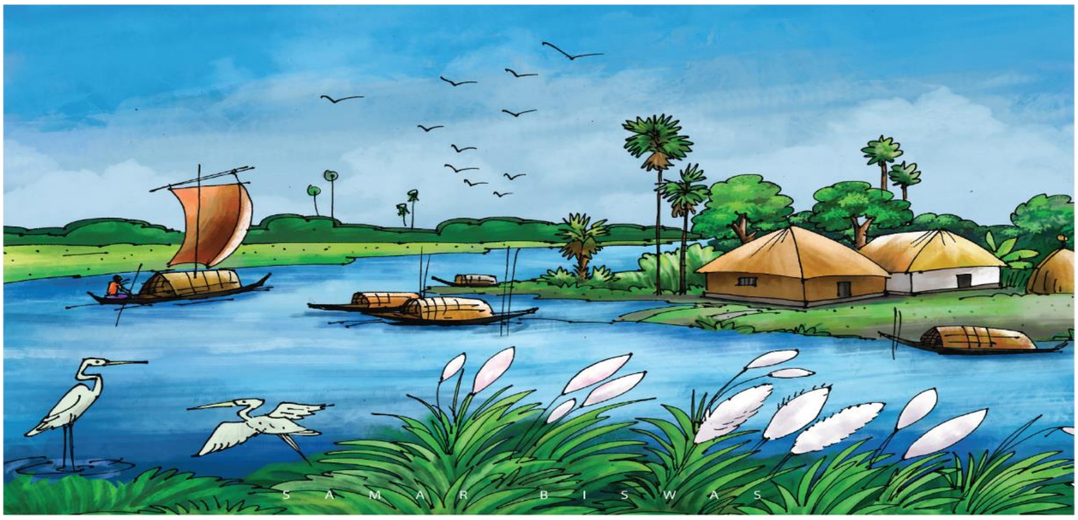
S A M A R B I S W A S

গ্রন্থপঞ্জি:

১) শিক্ষক সহায়িকা (২০২৩), ১ম শ্রেণি, শিল্পকলা (চারু ও কারুকলা, সংগীত, নৃত্যকলা, নাট্যকলা), এনসিটিবি, ঢাকা।

২) শিক্ষক সহায়িকা (২০২৩), ২য় শ্রেণি, শিল্পকলা (চারু ও কারুকলা, সংগীত, নৃত্যকলা, নাট্যকলা), এনসিটিবি, ঢাকা।

৩) শিক্ষক সহায়িকা (২০২৩), ৩য় শ্রেণি, শিল্পকলা (চারু ও কারুকলা, সংগীত, নৃত্যকলা, নাট্যকলা), এনসিটিবি, ঢাকা।

৪) পিটিআই ইন্সট্রাক্টর নির্দেশিকা (২০১৫), ডিপিএড এক্সপ্রেসিভ আর্ট, নেপ, ময়মনসিংহ।

৫) তথ্য পুস্তক (২০১৫), ডিপিএড এক্সপ্রেসিভ আর্ট, নেপ, ময়মনসিংহ।

৬) বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, চারু ও কারুকলা, প্রশিক্ষণ বিভাগ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

৭) সৈয়দ আলী আহসান, শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা,

৮) শিক্ষক নির্দেশিকা (২০১৩), সংগীত, এনসিটিবি, ঢাকা।

৯) করুণাময় গোস্বামী (১৯৯৫), সংগীত কোষ, বাংলা একাডেমি।

শিক্ষা গবেষণা উন্নয়ন

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
ময়মনসিংহ